ছোটদের পারস্য উপন্যাস
সুবোধ চক্রবর্তী
প্রাপ্তিস্থান
কাম্মিনী প্রকাশলয়
১১৫,অখিল মিস্ত্রি লেন
কলিকাতা-৯

প্রকাশক ঃ
শ্রীশ্যামাপদ সরকার
১১৫, অখিল মিস্ত্রী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

তৃতীয় প্রকাশ ঃ
শ্রাবণ ১৩৬৯

প্রচ্ছদ ঃ
নারায়ণ দেবনাথ

মুদ্রাকর ঃ
কালীমাতা প্রিন্টার্স
১৯/ডি/এইচ/১৪ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

ছোটদের

পারস্য উপন্যাস

॥ পূর্বাভাষ ॥

কোন এক সময়ে কাশ্মীরে তওঙ্গনবী নামে প্রজাহিতৈষী এক সুলতান ছিলেন। সুলতান যেমন প্রজাদের পুত্রসম জ্ঞান করতেন, প্রজারাও তাঁকে ততোধিক ভক্তি-শ্রদ্ধা করত। রাজ্য শাসনের গুরু-দায়িত্ব মাথায় থাকলেও তিনি কিন্তু ক্ষণিকের জন্যও ঈশ্বর-আরাধনা থেকে বিরত হননি ঈশ্বরের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম নিষ্ঠা।

সুলতান তওঙ্গনবী'র একটি পুত্র ও একটি কন্যা ছিল। পুত্রের শুধু অগাধ পাণ্ডিত্যই ছিল না, পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় দখলও ছিল যথেষ্ট। সুলতানের কন্যার নাম ছিল ফরোখনাজ। রূপসী তন্বী যুবতী ফরোখনাজের মধ্যেও নানা গুণের সমন্বয় ঘটেছিল। তাঁর রূপের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়লে বহুদেশ থেকে রাজা ও রাজপুত্রেরা সুলতানের প্রাসাদে আসতে লাগলেন। ফরোখনাজের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাঁরা তাঁর পাণিগ্রহণের জন্য সুলতানের কাছে বিভিন্নভাবে উৎসাহ প্রকাশ করতে শুরু করলেন।

সুলতান কন্যা ফরোখনাজের অদ্ভুত একটি অভ্যাস ছিল। তিনি সপ্তাহে একদিন দু'শ অপরূপ রূপযৌবন সম্পন্না যুবতী ও দু'তিন শ' বলিষ্ঠ দেহরক্ষী সঙ্গে নিয়ে গভীর বনে মৃগয়া করতে যেতেন। সুলতানের কন্যার এই মৃগয়া-গমনের দৃশ্য দেখার জন্য রাস্তার দু'ধারে উৎসাহী প্রজারা এমনভাবে ভীড় করে দাঁড়াত যে দেহরক্ষীদের সুতীক্ষ্ম তরবারী ব্যবহার করে তবে সুলতান-কন্যার পথ করে দিতে হ'ত। মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী জেনেও প্রজারা পতঙ্গের মত সুলতান-কন্যার রূপের আগুনে ঝাঁপ দিতে বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করত না। কে কার থেকে বেশী এগিয়ে রূপসী যুবতীর রূপ সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করে জীবন সার্থক করতে পারে এ নিয়ে রীতিমত প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হ'য়ে যেত। প্রজাদের এই নিষ্ঠুরভাবে মৃত্যুবরণে প্রজাহিতৈশী বৃদ্ধ সুলতান যারপর নাই ব্যথিত ও

মর্মাহত হলেন। প্রজাদের এই অকালমৃত্যু বন্ধ করার জন্য তিনি মনস্থ করলেন কন্যাকে যে-কোন ভাবে মৃগয়া থেকে বিরত করবেন।

এক সকালে তিনি কন্যাকে নিজের ঘরে ডাকিয়ে প্রজাদের এই অহেতুক মৃত্যু-প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বললেন—মা, তোমার রূপে পাগল হ'য়ে কত শত প্রজা উন্মাদের মত মৃত্যুবরণ করছে তা তুমি স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করছ। আমার ইচ্ছা তুমি মৃগয়ার খেয়াল বন্ধ করে প্রজাদের এই নিষ্ঠুর মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা কর।

পিতার কথায় সুলতান-কন্যার মনে বিষাদের কালো ছায়া নেমে এল! কিন্তু নিরুপায়, সুলতানের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। অনন্যোপায় হয়ে তিনি পিতাকে কথা দিলেন, নিজের খেয়াল চরিতার্থ করতে গিয়ে ভবিষ্যতে আর কোন দিনই প্রজাদের মৃত্যুর কারণ হবেন না।

সুলতান-কন্যা প্রজাদের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে পিতাকে কথা দিলেও তিনি কিন্তু ব্যাপারটাকে মন থেকে মেনে নিতে পারলেন না। সারাটা দিন বিমর্ষভাবেই কাটালেন! রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখলেন তিনি অভ্যাসমত রূপসী যুবতী ও দেহরক্ষীদের সঙ্গে নিয়ে গভীর জঙ্গলে মৃগয়া করতে গেছেন। মৃত্যুভীত-সন্ত্রস্ত বন্য পশুরা লোকজন ও অস্ত্রশস্ত্র দেখে জীবন রক্ষার জন্য ছুটাছুটি-দাপাদাপি শুরু করে দিয়েছে। এমন সময় সুলতান-কন্যা মৃত্যুভয়ে ভীত একটি হরিণকে ঝোপের আড়াল দিয়ে ছুটে পালাতে দেখে তার পিছন নিলেন। ঘোড়া ছুটিয়ে হরিণটিকে তীরবিদ্ধ করতে এগিয়ে যেতে যেতে এক সময় দেখলেন ব্যাধের জালে হরিণটি আটকা পড়েছে। মৃত্যুভয়ে ভীত হরিণটি জাল থেকে মুক্তি পাবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। কিন্তু হায়! মুক্তি পাওয়া তো দূরের কথা সে বরং জালে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়ল। হঠাৎ দেখেন উন্মত্ততাপ্রায় হরিণী তার স্বামীর উদ্ধারের জন্য মরিয়া হয়ে চেষ্টা করছে।

বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাস। হরিণী চেয়েছিল তার স্বামীকে

উদ্ধার করতে কিন্তু ফল হল বিপরীত! স্বামীকে উদ্ধার করল বটে, কিন্তু নিজে জালে জড়িয়ে পড়ল। এদিকে তার স্বামী ছাড়া পাওয়া মাত্র প্রাণ-ভয়ে গভীরতম জঙ্গলের দিকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, স্ত্রী'র পরিণতির কথা চিন্তাও করল না। ঠিক এমনি সময়ে হঠাৎ সুলতান-কন্যার ঘুম ভেঙে গেল। ব্যাপারটা তার মনে গভীর রেখাপাত করল।

অন্ধকার ঘরে পালঙ্কের ওপর বসে সুলতান-কন্যা সেই স্বপ্নে দেখা হরিণ-হরিণীর ব্যাপারটার কথা ভেবে প্রতিজ্ঞা করলেন, তিনি ভুলেও পুরুষের কপট ভালবাসায় মুগ্ধ হয়ে নিজেকে কারো হাতে সঁপে দেবেন না, কারো সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হ'য়ে নিজের সর্বনাশের পথ ডেকে আনবেন না।

এদিকে সুলতানের কন্যার অপরূপ রূপসৌন্দর্যের খ্যাতি দেশ-বিদেশ ছড়িয়ে পড়ল। আরব, বেলুচিস্হান, পারস্য, ইরান, তুরস্ক প্রভৃতি রাজ্যের সুলতান ও সুলতান-পুত্ররা কাশ্মীরের সুলতান তওঙ্গনবী'র কাছে পাণি-গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে পত্র লিখতে লাগলেন। ব্যাপারটা নিয়ে তিনিও কম ভাবিত নন। কার হাতে কন্যাকে সমর্পণ করা যায় এ নিয়ে তিনি যখন আকাশ-পাতাল ভেবে অস্হির, ঠিক এমনি সময়ে শাহজাদী ফরোখনাজ সজল চোখে পিতার সামনে দাঁড়ালেন। বিয়ের অসম্মতির কথা ব্যক্ত করতেই সুলতান যেন আকাশ থেকে পড়লেন। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হ'য়ে কন্যাকে কথা দিলেন যে, তাঁর সম্মতি ছাড়া তিনি বিয়ের ব্যবস্হা করবেন না।

সুলতান হিরাতসাহ একদিন কাশ্মীরের সুলতানের কাছে বহু উপঢৌকন সহ দূত পাঠিয়ে নিজ পুত্রের সঙ্গে ফরোখনাজের বিয়ের প্রস্তাব করলেন। হিরাতসাহের পুত্র ফরোখনাজের যোগ্যতম পাত্র। এমন একটি লোভনীয় প্রস্তাব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার সম্ভবনায় সুলতান ---বই মর্মাহত হলেন। কিন্তু ফরোখনাজ কিছুতেই বিয়েতে স্কাতে দিলেন না।

সুলতান হিরাতসাহের দূত আশাহত হয়ে স্বদেশে ফিরে গেলেন।

সুলতান তওঙ্গনবী কিন্তু ব্যাপারটা নিয়ে আর নিশ্চিন্তে বসে থাকতে পারলেন না। কন্যার এ-রকম মতিগতির পরিবর্তনের জন্য তিনি কন্যার প্রধানা ধাত্রী ফতেমাকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি তো তাকে নিজ-কন্যার মত পালন করেছ, তুমি কি বলতে পার, ফরোখনাজের বিয়ের ব্যাপারে অসম্মতির কারণ কি ?

ধাত্রী সামান্য ইতস্ততের পর ব্যক্ত করল—জাঁহাপনা, আপনি তাকে মৃগয়ায় যেতে নিষেধ করলে সে খুবই মনঃক্ষুন্ন হয়। এক রাত্রে সে এক দুঃস্বপ্ন দেখে এ-রকম সিদ্ধান্ত নেয়। তার মনে বদ্ধমূল ধারণা জন্মায় পুরুষজাতি অতিশয় বিশ্বাসঘাতক। তার এ-ধারণা যে ভ্রান্ত এ-সম্বন্ধে অনেক কথাই তাকে বুঝিয়েছি। কিন্তু হায় ! কোন যুক্তিতেই সে কান দিল না। বাধ্য হয়ে আমাকে তার এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গের চেষ্টা থেকে বিরত থাকতে হ'ল। সুলতান ফতেমাকে যার পর নাই পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন সে যেন যে-কোনভাবে শাহাজাদী ফরোখনাজকে তার ভ্রান্ত-প্রতিজ্ঞা থেকে সরিয়ে আনে। তিনি এও-উল্লেখ করলেন যে, সচ্চরিত্র পুরুষের প্রেমের কাহিনী শোনালে অবশ্যই তার ভাবান্তর ঘটবে এবং মনে বিয়ের ব্যাপারে আগ্রহ জাগবে। ধাত্রী ফতেমা সুলতানকে তাঁর নির্দেশ পালনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন।

এক রাত্রে শাহাজাদী ফরোখনাজ তার সখীদের সঙ্গে গল্প করছিলেন। ধাত্রী ফতেমা সে-গল্পের আসরের মধ্যমণি। এক সময় তিনি আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন—মা কতকগুলো অদ্ভুত গল্প আমার মনে জেগেছে। তুমি উৎসাহী হ'লে আমি গল্পগুলো শোনাতে পারি। ফরোখনাজ আগ্রহান্বিত হয়ে সামান্য এগিয়ে বসলেন। তার সখীদের মধ্যেও অত্যুগ্র আগ্রহ লক্ষ্য করে ফতেমা গল্পের ঝোলার মুখ খুললেন।

তার

আবুল কাসেমের কথা

কোন এক সময়ে তুরস্কের রাজধানী বোগদাদ নগরে তীক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন মহাপরাক্রমশালী এক সুলতান ছিলেন—নাম তাঁর হারুণ-অল-রসিদ। প্রজাপালক হিসাবে তাঁর খুবই খ্যাতি ছিল। প্রজাদের তিনি অন্তর দিয়ে ভালবাসতেন। প্রজারাও তাঁকে একান্ত আপনজন মনে করত। সুলতান প্রজাদের সুখ-দুঃখ, ব্যাথা-বেদনা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করার জন্য গভীর রাত্রে ছদ্মবেশে পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়াতেন। এভাবে প্রজাদের চোখের মণি হয়ে তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করে যথেষ্ট যশ ও খ্যাতি অর্জন করেন! তাঁর রাজত্বে জমিদার বা ধনিকশ্রেণী দরিদ্র ও দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে পারত না। তার একমাত্র কারণ হচ্ছে, কখন কোন ছদ্মবেশে কখন কোথায় উপস্থিত হবেন, কি শাস্তির বিধান দেবেন তা কারোজানা ছিল না। সর্বগুণে গুণান্বিত সুলতান হারুণ-অল-রসিদের মধ্যে একটা মাত্র দোষই লক্ষিত হ'ত তা হচ্ছে তিনি নিজের কাজের জন্য গর্ববোধ করতেন। তাঁর মন ছিল দাম্ভিকতা ও আন্তরিকতায় পূর্ণ। সবার কাছে পঞ্চমুখে আত্মপ্রশংসা করতেও এতটুকু ইতস্ততঃ করতেন না। কথা প্রসঙ্গে এমন মন্তব্যও করে বসতেন যে, তাঁর মত সুশাসক পৃথিবীতে দ্বিতীয় নেই। এই দাম্ভিকতার জন্যই তিনি সবার নিন্দার পাত্র হয়ে উঠলেন।

সুলতান হারুণ-অল-রসিদের এক অতিবৃদ্ধ, বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ উজির ছিলেন। তাঁর নাম ছিল জাফর খাঁ। সুলতানের এই অগাধ দাম্ভিকতায় তিনিও কম বিরক্তিবোধ করতেন না। একদিন বাধ্য হয়েই সুলতানের কাছে করজোড়ে নিবেদন করলেন—হুজুর একমাত্র মূর্খরাই আত্মপ্রশংসার মাধ্যমে দাম্ভিকতা প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু পরিণামে গৌরবলাভ তো হয়-ই না, উপরন্তু লোকের কাছে দারুণভাবে হাস্যস্পদই হয়ে থাকে। অতএব আমার

বিনীত নিবেদন, আপনি অনুগ্রহ করে এই নিন্দনীয় কাজ থেকে বিরত্ থাকুন।

উজিরের কথায় সুলতানের মধ্যে বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিল, ক্রোধের সঞ্চার হ'ল। ক্রোধোন্মত্ত সুলতান গর্জে উঠলেন—উজিরসাহেব আপনার ধৃষ্টতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি! আমার মত ঐশ্বর্যশালী প্রজাপালক সুলতান পৃথিবীতে দ্বিতীয়টি আপনি দেখাতে পারেন?

মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে সাহসে ভর করে বৃদ্ধ উজির করজোড়ে নিবেদন করলেন—জাঁহাপনা, অপরাধ নেবেন না। যদি অভয় দেন নিবেদন করি, আপনার রাজ্যেরই বাসোরা নগরে আবুল কাসেম নামে এক প্রজা বাস করে। তার দয়াশীলতা, দানধ্যান ও সর্বোপরি তার অগাধ বিত্তের কথা শুনলে আপনি বিস্মিত হবেন। যদি আগ্রহী হন চলুন, তাকে দেখলেই আপনার দ্বিধা দ্বন্দ্ব দূর হবে এবং নিজের সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাও ঘুচে যাবে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার! তিনি কিন্তু ভুলেও কারো কাছে মুখ ফুটে নিজের কথা ব্যক্ত করেন না।

বৃদ্ধ উজিরের কথায় সুলতানের ক্রোধ উপশম হওয়া তো দূরের কথা, বরং শতগুণ বেড়ে গেল। তিনি সেনাপতিকে ডেকে জাফরকে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিলেন। জাফর কারাগারে নিক্ষিপ্ত হলেন।

সুলতান বিষণ্ণ মনে নিজ কক্ষে পায়চারি করছেন। এমন সময় প্রধানা বেগম সেখানে এলেন। সুলতানের এই আকস্মিক ভাবান্তর লক্ষ্য করে জিজ্ঞেস করলেন—প্রাণেশ্বর আপনার মধ্যে কেমন একটা অস্হিরতা লক্ষ্য করছি যে! তবিয়ত ভাল তো?

প্রিয়তমা মহিষীর অত্যুগ্র আগ্রহ দেখে সুলতান উজিরের ব্যাপার বিস্তারিত বর্ণনা করলেন।

মহিষী ব্যাপারটা হৃদয়ঙ্গম করে বললেন—জাঁহাপনা। প্রকৃতিস্হ হোন, ক্রোধ সম্বরণ করুণ। কোন ব্যাপারই পরিষ্কার না জেনে

কারো প্রাণনাশ করা সঙ্গত নয়। বৃদ্ধ উজিরকে অন্ধ কারায় নিক্ষেপ করে মোটেই সঙ্গত কাজ করেন নি। সে যে আপনাকে সত্য কথা বলেছে, তারই নিশ্চয়তা কোথায় ? অতএব সব দিক বিবেচনা করে বলছি, অনুগ্রহ করে সর্বপ্রথমে ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হোন। পরে বিচার-বিবেচনা করে যা হয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

মহিষীর কথায় সুলতান যেন সম্বিৎ ফিরে পেলেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে এক সময় মুখ খুললেন—। প্রিয়ে, তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার পরামর্শই গ্রহণ করলাম। অন্যের ওপর ভরসা না করে আমি নিজেই বসোরা যাব, সব কিছু স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করব। যদি উজিরের কথা মিথ্যে হয় তবে তাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করব, সত্য হলে তাকে অবশ্যই বিশেষভাবে সম্মানিত করব।

সুলতান পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বসোরার দিকে যাত্রা করলেন তখন মধ্যরাত্রি। অন্ধকারের কালো ঘোমটা ভেদ করে তেজস্বী ঘোড়া ছদ্মবেশী সুলতানকে নিয়ে বসোরার দিকে ছুটে চলল।

সুলতান সোজা বসোরায় পেঁছে এক সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। কথা প্রসঙ্গে সরাইখানার মালিককে জিজ্ঞেস করলেন—আচ্ছা বলতে পারেন, আবুল কাসেম নামে কেউ নগরীতে থাকেন কি?

সরাইখানার মালিক জবাব দিল—হ্যাঁ অবশ্যই।

—নগরের কোনদিকে তিনি থাকেন জানা আছে কি ? আর একটা কথা, শুনেছি তিনি অতি ধনবান, দাতা হিসাবেও নাকি তিনি এ-অঞ্চলে খুবই খ্যাত, কথাটা কি সত্য ?

—হ্যাঁ, মহাশয়—অত্যন্ত সত্য কথা। শুধু আমি কেন, বসোরা নগরের ছেলে-বুড়ো সবাই তাঁর দান-ধ্যানের কথা জানেন। দেবতুল্য লোকটি দীন-দুঃখীদের মা-বাপ।

সরাইখানার মালিকের কথায় সুলতানের মনে যেন আনন্দ আর ধরে না। সকাল হ'তে না হ'তেই তিনি ঘোড়া ছুটিয়ে চললেন আবুল কাসেমের বাড়ির দিকে। কিছু দূরে গিয়ে এক শিল্পকারের

কাছে ব্যাপারটা উত্থাপন করতেই লোকটি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে জিজ্ঞেস্ করলেন—কী ব্যাপার বলুন তো মশায় ? আপনি কি এ-রাজ্যে থাকেন না ? মহামানব আবুলকাসেম একজন পৃথিবী-বিখ্যাত লোক ! আপনি তাঁর বাড়ি চিনতে না পারেন, কিন্তু তাকেও চেনেন না শুনে সত্যিই আশ্চর্যবোধ করছি ।

কোন রকমে ঢোক গিলে সুলতান আমতা আমতা করে জবাব দিলেন—কিছু মনে করবেন না মশায়, আমি বিদেশী, এখানে নতুন এসেছি । যদি অনুগ্রহ করে তাঁর বাড়ীটা দেখিয়ে দেন, নতুবা সঙ্গে কাউকে দেন বড়ই উপকার হয় ।

ছদ্মবেশী সুলতানের অনুরোধে শিল্পকার একটি বালক'কে সঙ্গে দিল আবুল কাশেমের বাড়িটা দেখিয়ে দেবার জন্য। যথাস্থানে পৌঁছে সুলতান পথ-প্রদর্শক ছেলেটার হাতে একটা মোহর দিয়ে বিদায় করলেন ।

আবুল কাসেমের সুরম্য প্রাসাদ দেখে সুলতান তো বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন । তিনি বিস্ময়ভরা চোখে চারিদিক তাকিয়ে দেখতে লাগলেন । চারদিকে প্রহরারত শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে, কতলোক বাড়ির মধ্যে অবাধে যাতায়াত করছে । কেউ কাউকে ডেকেও জিজ্ঞেস করছে না—ওহে, তোমরা কারা ? কোথায় যাচ্ছ ?

সুলতান প্রাসাদের সৌন্দর্য দেখতে দেখতে সদর দরজা ডিঙিয়ে বাড়ির মধ্যে প্রবেশ করলেন । সামনেই এক প্রহরীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন—'আমি বহু দূরদেশ থেকে এসেছি, তোমাদের প্রভুর দর্শনপ্রার্থী । আমাকে একটিবার পৌঁছে দিতে পার ?

প্রহরী সুলতানকে দেখেই বুঝে নিল তিনি যে-ই হোক না কেন, সামান্য লোক নন । মুহূর্তমাত্র দেরী না করে সে সুলতানের কাছে ছুটে গেল, বিদেশী দর্শনপ্রার্থীর সংবাদ দিল ।

আবুল কাসেম বিদেশীর আগমনবার্তা পাওয়া মাত্র নিজেই ব্যস্ত হয়ে ছুটে এসে ছদ্মবেশী সুলতানকে অভ্যর্থনা করে বিশ্রাম-

কক্ষে নিয়ে গেলেন। সুলতানকে সুদৃস্য আসনে বসতে দিয়ে নিজে ঘরের মেঝেতে বসলেন।

আবুল কাসেম এক সময় সবিস্ময়ে নিবেদন করলেন—মহাশয় আজ্ঞা হোক আপনার জন্য কি করতে পারি?

সুলতান বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে স্বাভাবিকভাবেই জবাব দিলেন—দেখুন কিছুদিন যাবৎ আপনার সুখ্যাতির কথা শুনে আপনার দর্শনলাভের আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। মনের অফুরন্ত কৌতূহল চরিতার্থ করতেই এখানে ছুটে আসতে হয়েছে।

আবুল কাসেম যথোচিত শিষ্টাচারের সঙ্গে জবাব দিলেন—এ তো আমার পরম সৌভাগ্য। যদি অনুগ্রহ করে আপনার পরিচয় দেন ধন্য হব।

সুলতান সামান্য ইতঃস্ততের পর বললেন—আমি একজন বণিক, বোগদাদ নগরে বাস করি। দেশ-বিদেশে ঘুরে বাণিজ্য করাই আমার পেশা। কার্যোপলক্ষ্যে ঘুরতে ঘুরতে এ রাজ্যে এসে হাজির হয়েছি। কাল সন্ধ্যায় সরাইখানায় উঠেছি। ভাবলাম এই সুযোগে আপনার দর্শনলাভ করি।

আবুল কাসেম ছোট করে হেসে নিবেদন করলেন—মহাশয়, আপনার পায়ের ধুলো পেয়ে আমার বাড়ি ধন্য হ'ল। আপনার মত একজন বিদেশীকে হাতের কাছে পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আপনার সেবা করার অনুমতি দিয়ে আমাকে ধন্য করুন।

সুলতান অনুরূপ হাসি বিনিময় করে বললেন—মহাশয়, আপনার সৌজন্যে আমি মুগ্ধ। আমি তো আগেই বলেছি, দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানোই আমার কাজ। কত জায়গায় গিয়েছি, কত মানুষের সঙ্গেই তো পরিচয় হ'ল। কিন্তু আপনার মত এতগুণের সমাবেশ দ্বিতীয় কারো মধ্যেই নজরে পড়ে নি।

সুলতান ও আবুল কাসেম যখন এমনি কথোপকথনে মগ্ন তখন আট-দশ জন পরিচারক সুদৃশ্য সোনার থালায় করে নানা

রকম মিষ্টান্ন এবং সুগন্ধযুক্ত সুরাপূর্ণ পাত্র সুলতানের সামনে রেখে সেলাম করে বিদায় নিল। কয়েক মুহূর্ত পরে সুদৃশ্য বেশভূষায় সজ্জিতা দশ-বারোজন পরিচারিকা সুস্বাদু ফলমূল ও সুগন্ধি পরিপূর্ণ পাত্র সুলতানের সামনে এনে রাখল।

আবুল কাসেমের বিশেষ অনুরোধে সুলতান সামান্য আহার করলেন। আহারান্তে পঞ্চমুখে আবুল কাশেমের অতিথি পরায়ণতার প্রশংসা করতে লাগলেন।

আবুল কাসেম নিজের প্রশংসার কথা শুনে কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। এক সময় সুলতানকে থামিয়ে দিয়ে বললেন—'মহাশয় কিছু মনে করবেন না, আপনার মত একজন মহাত্মার মুখে আমার মত একজন সামান্য দীনহীনের প্রশংসা মানায় না! আপনার জন্য আমি যেটুকু করতে পেরেছি, এ তো মানবিক ধর্মমাত্র! মানুষ মাত্রেই এ কর্তব্যজ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

সুলতান সেদিন আবুল কাসেমের প্রাসাদেই থেকে গেলেন। নানা রকম সুস্বাদু ও উপাদেয় খাদ্যদ্রব্য সহযোগে মধ্যাহ্ন ভোজ সেরে বিশ্রামের জন্য একটা সুসজ্জিত ঘরে গেলেন। তিনি অবাক হয়ে আবুল কাসেমের ঐশ্বর্য দেখতে লাগলেন। যতই দেখছেন ততই যেন অবিশ্বাস্য এক অত্যাশ্চর্য জগতে ডুবে যাচ্ছেন তিনি! বার বার এদিক-ওদিক তাকিয়ে ভাবছেন—উজিরের কথা একবর্ণও মিথ্যা নয় তো, প্রতিটি বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে তো? এঁর মত ঐশ্বর্যশালী ব্যক্তি এই নিখিল বিশ্বে দ্বিতীয়টি আছেন বলে মনে হয় না! সবচেয়ে লক্ষণীয় হচ্ছে তিনি যথার্থই বিনয়ের অবতার! প্রতিটি মানুষের প্রতি সমান আচরণ ও সমান শিষ্টাচার প্রদর্শনও তাঁর উল্লেখযোগ্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

সুলতান একমনে বিশেষ কিছু একটা ভাবছেন অনুমান করে আবুল কাসেম মুচকি হেসে জিজ্ঞেস করলেন—মহাশয়, মনে হচ্ছে, আপনি কিছু একটা ভাবছেন?

আবুল কাসেমের আকস্মিক প্রশ্নে সুলতান রীতিমত হকচকিয়ে জবাব দিলেন—কই, কিছুই না তো ?

আবুল কাসেমের অনুরোধে সুলতান সুবাসিত সুরার পাত্রটি হাতে তুলে নিলেন। এমন সময় একদল রূপসী যুবতী কিন্নরী নানা রকম বাদ্যযন্ত্রসহ ঘরে ঢুকল। তারা আবুল কাসেমের নির্দেশে নাচগানের আসর বসাল। কিন্নরীদের সুমিষ্ট কণ্ঠের গান ও সুনিপুণ ছন্দবদ্ধ নাচ দেখে সুলতান যারপর নাই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। অভাবিত আবেগে চোখের পাতা জড়িয়ে আসতে লাগল। ভাববিমুগ্ধ সুলতানের মনে জেগে উঠল—আমারও তো একদল কিন্নরী রয়েছে বটে, তারাও নাচ-গানে পারদর্শী বটে, কিন্তু কই তাদের মধ্যে তো মুহূর্তের জন্যও এমন নৈপুণ্যের ঢেউ নজরে পড়েনি, এমনতর কিন্নরকণ্ঠের গানও কোনদিন শুনিনি ! এমন নৃত্য-গীত পটীয়সী নর্তকী স্বর্গের অপ্সরা ভিন্ন মনুষ্য জাতির মধ্যে কেউ আছে বলে জানা ছিল না।

ছদ্মবেশী সুলতান যখন কিন্নরীদের নাচ-গানে বিভোর, আবুল কাসেম তখন ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি বাঁ হাতে একগাছি ছড়ি এবং ডান হাতে অপূর্ব সুন্দর একটি চারাগাছ নিয়ে ফিরে এলেন। চারাগাছটি মূলভাগ স্বর্ণময়, শাখা-প্রশাখা ও পত্র হীরক খচিত এবং পুষ্পরাশি রত্ন খচিত।

তার শীর্ষদেশে নানা রকম সুগন্ধি দ্রব্যে তৈরী অপরূপ সুন্দর একটি ময়ূর শোভা পাচ্ছে। আবুল কাসেম ঘরে ঢুকে সসম্ভ্রমে সুদৃশ্য ও বহু মূল্যবান চারাগাছটি সুলতানের পায়ের কাছে রেখে দিলেন।

সুলতান হাত বাড়িয়ে গাছটি তুলে নিয়ে বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে বার বার এদিক-ওদিক ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগলেন।

একসময় ঘটল এক অভাবনীয় চমকপ্রদ ঘটনা। আবুল কাসেম আচমকা হাতের ছড়িটা পাখির মাথায় ছোঁয়াতেই ওটা অপরূপ

ভঙ্গিমায় নাচতে লাগল। শুধু কি তা-ই? ময়ূরের দেহ নিসৃত সুগন্ধ ঘরময় ছড়িয়ে পড়ল। সুলতান অপলক চোখে তাকিয়ে ভাবছেন, আবুল কাসেমের কাণ্ড যত দেখছেন ততই যেন তাঁকে এক গভীর বিস্ময়ের জগতে ঠেলে দিচ্ছে। কৌতূহল দমন করতে না পেরে জিজ্ঞেসই করে বসলেন—মহাশয়, এমন আশ্চর্যজনক গাছটি আপনি কোথায় পেলেন?

আবুল কাসেম সুলতানের প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে গাছটি হাতে করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবুল কাসেমের এরকম আচরণে সুলতান বিস্মিত হলেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন কী ব্যাপার লোকটি এমন অভদ্র ভাবিনি তো! আমার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়েই চলে গেলেন। সবই আছে, কিন্তু লোকের সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হয় মোটেই জানে না দেখছি। তাছাড়া কৃপণও বটে! কিন্তু উজিরের কথা প্রতিটি অক্ষরে অক্ষরে মিলে যাচ্ছে বটে, কিন্তু একটা কথা ঠিক বলে নি। আবুল কাসেমের মত এতবড় দাতা নাকি ভূমণ্ডলে দ্বিতীয় আর নেই, অত্যন্ত অসত্য মন্তব্য করেছে উজির। তার অসত্য ভাষণের নিদর্শন হচ্ছে যদিও ছদ্মবেশে এসেছি, অপরিচিত ভদ্রজন তো! আমার যখন গাছটি পছন্দ হয়েছে লোকটা তো গাছটি আমাকে উপহার স্বরূপ দিতে পারতো। অতএব একে দাতা বলে চিহ্নিত করা যায় না।

সুলতান যখন আবুল কাসেমের আচরণ প্রসঙ্গে ভাবছেন, ঠিক এমন সময় আবুল কাসেম ছোট্ট একটি বালককে সঙ্গে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। বালক ঘরে ঢুকে তার হাতের সুরার পাত্রটি সুলতানের দিকে এগিয়ে ধরল। সুলতান পাত্রটি হাতে নিয়ে পাত্রের সুরাটুকু পান করে শূন্য পাত্রটি বালকের হাতে দিতে গিয়ে চমকে উঠলেন—একী এ ত পূর্ণ পাত্র। শূন্য পাত্রে সুরা এল কোত্থেকে! পুনরায় পাত্রের সুরাটুকু নিঃশেষ করে যেই পাত্রটি বালকের হাতে তুলে দিতে যাবেন, আবার সেই অদ্ভুত কাণ্ড, পাত্রটি সুরাপূর্ণ দেখতে পেলেন। পূর্বের রত্ন ও ময়ূর চিহ্নিত চারাগাছটি প্রসঙ্গ বিস্মিত

হয়ে আবুল কাসেমকে জিজ্ঞেস করলেন—। মহাশয়! কী ব্যাপার বলুন তো, এমন আশ্চর্য-জনক পাত্র আপনি কোথায় পেলেন?

আবুল কাসেম মুচকি হেসে জবাব দিলেন—। মহাশয় এ প্রশ্নের সঠিক জবাব দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। লোকমুখে শুনেছি, কোন এক অজ্ঞাত পরিচয় ফকির নাকি এ-পাত্রটি তৈরী করেছেন। কথা কটা বলে আবুল কাসেম বালকটিকে নিয়ে বাড়ীর ভেতরে চলে গেলেন।

আবুল কাসেমের আচরণে সুলতান বিস্মিত হয়ে ভাবতে লাগলেন—কী ব্যাপার, লোকটি কী তবে বিন্দুমাত্রও শিষ্টাচার জানে না? এটি কি একজন ভদ্রলোকের প্রশ্নের জবাব দেবার ধরন হ'ল! তাছাড়া অদ্ভূত জিনিস কে তাঁর কাছে দেখতে চাইছে? তাছাড়া ব্যাপারটা ভাল করে দেখা ও বোঝার আগেই নিয়ে চলে যাচ্ছেন, এটা কেমনতর ভদ্রতা হ'ল? ছিঃ-ছিঃ-ছিঃ উজির একেবারে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছিলেন! ঠিক আছে, দেশে ফিরে তাকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়ব অপদার্থটিকে যদি শূলে না চড়াই, তবে আমি সুলতানই না।

বোগদাদের সুলতান উজিরের উক্তি স্মরণ করে যেন ক্রোধে ফেটে পড়ছিলেন। হঠাৎ আবুল কাসেমকে দরজায় দেখতে পেয়ে মুখ তুলে তাকালেন। একটি রূপসী যুবতীর হাত ধরে তিনি চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকলেন। যুবতীটির সর্বাঙ্গে রূপের জোয়ার। পৃথিবীর যাবতীয় রূপ-সৌন্দর্য যেন একত্রে পুঞ্জীভূত! রূপের আভায় চোখ ঝলসে যাওয়ার উপক্রম। বহুমূল্য স্বর্ণালঙ্কারের মণিমুক্তোগুলো থেকে ঠিকরে আলো বেরিয়ে আসছে। রূপসী যুবতীর রূপ-সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হয়ে সুলতান তাকে হাত ধরে নিজের পাশে নিয়ে বসালেন। সুলতানের মুগ্ধভাব দেখে আবুল কাসেম যুবতীর গুণগান করতে লাগলেন। এক সময় তিনি একটি বীণা এনে হাতে দিলেন। তার নরম নরম

আঙুলগুলোর ছোঁয়ায় বীণার তারগুলো ঝনঝনিয়ে উঠল। শুরু হল মন-পাগল করা রসালাপ। সুলতান মন্ত্রমুগ্ধের মত বীণার সঙ্গীত-লহরী শুনতে লাগলেন। বীণা বাদন বন্ধ হলে সুলতান সম্বিৎ ফিরে পেয়ে উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বলে উঠলেন—মহাত্মন, আপনার মত ভাগ্যবান এই ধরাধামে বিরল। আপনি বিশ্বের অন্যতম ব্যক্তি বললেও হয়ত ভুল হবে না।

সুলতানের কথায় আবুল কাসেম এবারেও যেন কর্ণপাত করলেন না। যুবতীর হাত ধরে মুচকি হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। আবুল কাসেমের ব্যবহারে সুলতান এবারও ব্যথিত ও মর্মাহত হলেন।

কিছুক্ষণ পরে আবুল কাসেম আবার ঘরে ঢুকলেন। এবার কিন্তু কাউকে সঙ্গে আনলেন না, একাই ফিরে এলেন।

সুলতান ও আবুল কাসেম মুখোমুখি বসে দেশ-বিদেশের গল্পে মাতলেন। দীর্ঘসময় ধরে কথোপকথনের পর সুলতান বললেন—মহাশয়, এবার যে আমাকে উঠতে হয়। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে আর দেরী করা সম্ভব নয়। আপনার অনুমতি পেলে যাত্রা করতে পারি।

আবুল কাসেম যথোচিত বিনয় ও সৌজন্য প্রদর্শন করে সুলতানের সঙ্গে সদর দরজা পর্যন্ত এসে বিদায় সম্ভাষণ জানালেন।

আবুল কাসেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সুলতান ঘোড়ায় চাপলেন। ধীর-মন্থর গতিতে হেলে-দুলে সুলতানের বিশাল দেহী ঘোড়াটা এগিয়ে চলল। ঘোড়ার পিঠে বসে সুলতান ভাবছেন আবুল কাসেম সম্বন্ধে উজির জাফর যা যা বলেছে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তার অগাধ ঐশ্বর্য ও অভূতপূর্ব শিষ্টাচার যে-কোন মানুষকে মুগ্ধ না করে পারে না। ভারতবর্ষ তোলপাড় করলেও এমন ঐশ্বর্যের সন্ধান পাওয়া দুষ্কর। ময়ূর-সুশোভিত যে বৃক্ষ দেখলাম বিশ্বের কোন রাজরাজেশ্বরেরও আছে বলে মনে

হয় না। তা ছাড়া যে-বালক সুরা পাত্র নিয়ে এসেছিল, পঞ্চমুখে তার গুণ কীর্তন করলেও শেষ হবার নয়। সবশেষে রূপবতী যুবতী ? পৃথিবীর সৌন্দর্যরাশি যেন তার দেহে পুঞ্জীভূত করা হয়েছে। উজির জাফর প্রতিটি বর্ণ সত্য বলেছে। আবুল কাসেম তুমি যথার্থই ভাগ্যবান, তবে তুমি যেমন ধনকুবের, তেমন দাতা নও। আমি তোমার ময়ূরশোভিত বৃক্ষ ও সুরাপাত্র হাতে বালকের যথেষ্ট প্রশংসা করলাম, তোমার কি উচিত ছিল না তার কিছু না কিছু আমাকে প্রদান করা ? তবে তোমাকে দাতা বলে প্রশংসা করি কিভাবে ? তাই তোমাকে দাতা বলব না, তোমাকে কৃপণ বলতে বাধ্য হচ্ছি। তোমার ধনগর্বই সার। কিন্তু উজির তাকে আমার চেয়ে দাতা বলে ব্যাখ্যা করেছে। অতএব উজির একথা অবশ্যই সত্য বলেনি। দেশে ফিরে তাকে উপযুক্ত শাস্তি প্রদান করব।

সুলতান আবুল কাসেমের কথা ভাবতে ভাবতে সরাইখানাভিমুখে অগ্রসর হতে লাগলেন। সরাইখানায় পা দিতেই বিস্ময়ে থমকে দাঁড়ালেন। সুলতানকে বিদায় সম্ভাষণ জানানোর বহু পূর্বেই আবুল কাসেম মূল্যবান বহুপ্রকার পট্টবস্ত্র, কয়েকটি তেজস্বী ঘোড়া, কয়েকটি উট, পূর্বকথিত কিন্নরী, দশটি ভৃত্য, ময়ূরশোভিত সেই রত্নময় বৃক্ষ, বালকসহ সেই সুরাপাত্র, রূপের আধার সেই কিন্নরকণ্ঠী যুবতী প্রভৃতি বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ সরাইখানায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। অভাবনীয় উপহারসামগ্রী দেখে সুলতান কয়েক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে রইলেন। আবুল কাসেমের দানশীলতা দেখে রীতিমত মূর্ছা যাবার উপক্রম। কোন রকমে বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে সুলতান সরাইখানায় ঢুকলেন। সুলতানকে দেখে সবাই নতজানু হয়ে কুর্নিশ করে সসম্ভ্রমে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে আবুল কাসেম লিখিত একটি পত্র সুলতানের হাতে দিল। সুলতান ব্যস্ত হয়ে পত্রটির ভাঁজ খুলে চোখের সামনে ধরলেন—মহামান্য মহাশয় !

আপনি যে অনুগ্রহ করে আতিথ্য গ্রহণ করেছেন তার জন্য সহস্র ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনার শুভ পদার্পণে আমার গৃহ পবিত্র হ'ল। আপনার কাছে আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ যদি অধমের পক্ষ থেকে কোন ভুল-ত্রুটি হয়ে থাকে নিজগুণে মার্জনা করে নেবেন। আপনি যে ময়ূরশোভিত ও রত্নখচিত বৃক্ষ এবং সুরাপাত্র হাতে বালককে দেখে প্রশংসা করছিলেন তা পাঠালাম, অনুগ্রহ করে ওগুলো গ্রহণ করে অধমকে ধন্য করবেন। আমাদের প্রথম পরিচয়কে স্মরণীয় করে তোলার জন্য সঙ্গে আরও কিছু উপঢৌকন পাঠালাম। অনুগ্রহ করে এগুলোও যদি স্বদেশে নিয়ে যান তবে এই অধম ধন্য হবে। আমি একটি রীতি মেনে চলি, কেউ আমার গৃহে এসে কোন দ্রব্য দেখে আনন্দ প্রকাশ করলে তা বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ তাকে প্রদান করে থাকি, ওসবের ওপর আমার আর কোন স্বত্ব থাকে না। সব শেষে আমি আবারও অনুরোধ রাখছি, আমার পক্ষ থেকে প্রেরিত দ্রব্যসামগ্রী গ্রহণ করে আমাদের সদ্যলব্ধ বন্ধুত্বকে দীর্ঘস্থায়ী করলে ধন্য হ'ব।

বিনীত—

আবুল কাসেম

পত্রপাঠ শেষ করে সুলতান কাগজটি ভাঁজ করতে করতে তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন—আবুল কাসেমের ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। উজির জাফর যা বলেছে, এই মুহূর্তে স্বীকার করতেই হচ্ছে, প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সত্যি আমি কী অর্বাচীন! আবুল কাসেম কিপ্টে, দান করার ক্ষমতা নেই ভেবে এতক্ষণ কত কুকথাই তার সম্বন্ধে ভেবেছি। স্বীকার না করে উপায় নেই, তাঁর মত দানশীল সহৃদয় ব্যক্তি পৃথিবীতে সত্যিই দ্বিতীয়টি নেই। রাজ-রাজরাগণ যে-সব মহামূল্য ও অত্যাশ্চর্য দ্রব্য চোখেও দেখেন নি, তা তিনি অবলীলাক্রমে অজ্ঞাত কুলশীল এক ব্যক্তিকে বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ উপঢৌকন হিসেবে প্রদান করলেন। হে আবুল কাসেম তুমি ধন্য তোমাকে বন্ধুরূপে পেয়ে

আমিও নিজেকে ধন্য মনে করছি। আর উজির জাফর, তোমার জীবনও ধন্য। এহেন মহাত্মার সন্ধান পেয়ে আমি নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিলাম আত্ম-অহঙ্কারেই মগ্ন ছিলাম। আজ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি, আবুল কাসেমের পাশে আমি কতই না নগণ্য। স্বদেশে ফিরে উজির জাফরের প্রতি কুব্যবহার করার প্রায়শ্চিত্ত করব, রত্ন সিংহাসনে বসিয়ে সেবা করব।

পর মুহূর্তেই সুলতান ভাবলেন আবুল কাসেম এমন ধন-সম্পদ কোথায় পেলেন, এমন অলৌকিক দান করা কী করেই বা মানুষের পক্ষে সম্ভব! এর অনুসন্ধান আমাকে করতেই হবে; যথোচিত সন্ধান না পেয়ে বোগদাদ নগরীতে ফিরে যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অনুসন্ধান-পর্ব চালাতে যদি আমাকে এখানে কিছুদিন থাকতেও হয়, অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করতে হয় তবুও আমি পশ্চাদপদ হব না।

উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে সুলতান সরাইখানায় নির্ঘুম রাত্রি কাটালেন। কাক-ডাকা সকালে ঘোড়া ছুটিয়ে আবুল কাসেমের প্রাসাদে হাজির হলেন। ছদ্মবেশী সুলতান সবিনয়ে নিবেদন করলেন—মহাশয় আপনার দানশীলতা আমাকে মুগ্ধ করেছে, বিস্মিতও বটে। আমার বিশ্বাস আপনার মত দ্বিতীয় দাতা পৃথিবীতে বিশেষ করে ভারতবর্ষে, আর কেউ আছে বলে আমার জানা নেই। আপনি আমাকে যে সব উপঢৌকন পাঠিয়েছেন, আমি ওগুলোর অনুপযুক্ত। অপরাধ নেবেন না, আপনি অনুগ্রহ করে তা ফিরিয়ে নিন। আমি তো বলেছি, আমি সামান্য বণিক মাত্র। আপনার প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী আমার পক্ষে বাস্তবিকই ভয়ের কারণ। আমাকে ক্ষমা করবেন, ওগুলো ফিরিয়ে নিন।

সুলতানের কথায় আবুল কাসেম খুবই মনঃক্ষুন্ন হলেন। ক্রোধ প্রকাশ করে বলে উঠলেন—মহাশয়, আপনার কথায় মনে হচ্ছে এই অধম আপনার নিকট মারাত্মক অপরাধ করেছে। নতুবা আপনি এমন কথা বলবেন কী করে। কোন দোষ-ত্রুটি না থাকলে

কেউ প্রদত্ত উপঢৌকন তার মালিককে ফিরিয়ে দেবার প্রস্তাব করতে পারে ব'লে আমার জানা নেই।

সুলতান লজ্জিত হয়ে বললেন—সে কী মশায় আপনি এ-রকম কথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না। আপনার ব্যবহারে আমি প্রীত। কিন্তু একটা কথা বলতে চাচ্ছি, যদি অভয় দেন তবে বলি।

আবুল কাসেম মুচকি হেসে বললেন—আপনি নির্দ্বিধায় বলতে পারেন। বলুন, কি বলতে চাচ্ছেন ?

—আপনি এই যে মুক্ত হস্তে দান করে যাচ্ছেন, শীঘ্রই আপনার ধনভাণ্ডার শূন্য হয়ে যাবে। আমার মনে হয়—

আবুল কাসেম সুলতানের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন—আমার ধনক্ষয়ের আশংকায় আপনি এ-কথা বলতে চাচ্ছেন বুঝতে পেরেছি। তবে এ-রকম আশংকার কোন কারণ নেই। আপনার জানা নেই, আমি প্রতিদিনই ঠিক এমনিভাবেই দান করে থাকি। এমনি সহস্রগুণ দানেও আমার ভাণ্ডার শূন্য হবার নয়। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনি যদি এর কারণ শোনেন তবে আপনার সংশয় দূর হবে। আপনি আগ্রহী হ'লে আমি সব কথা বিস্তারিতভাবে আপনার কাছে ব্যক্ত করতে পারি।

আবুল কাসেমের অতীত কথা

সুলতান আবুল কাসেমের অতীত কথা শোনার আগ্রহ প্রকাশ করলে আবুল কাসেম বললেন—মহাশয়, আমার পূর্বপুরুষরা মিশর দেশে বাস করতেন। সে দেশে কায়রো নামে একটি নগর রয়েছে তা অবশ্যই আপনার অজানা নয়। আমার পিতাও সেই কায়রো নগরেই বাস করতেন। তাঁর নাম ছিল আবদুল আজিজ। তিনি ছিলেন রত্ন-ব্যবসায়ী। ব্যবসা ছিল খুবই রমরমা। দু'হাতে পয়সা রোজগার করেছেন। কায়রোর রাজা ছিলেন দুর্দান্ত প্রকৃতির লোক। যদি কোন ক্রমে শুনতে পান কোন প্রজা বিপুল সম্পত্তির অধিকারী তবে বলপূর্বক তা ছিনিয়ে নিতেন। এ রকম আশঙ্কায় আমার পিতা কায়রো ত্যাগ করে বসোরায় এসে আশ্রয় নেন। এখানে এসে এক বণিক-কন্যাকে বিয়ে করে ঘর সংসার পাতেন। সেই বণিক-কন্যার গর্ভেই আমি জন্মলাভ করি। পিতার বৃদ্ধ বয়সের সন্তান বলে পিতা আমাকে খুবই ভালবাসতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ মাত্র পনের বছর বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ ঘটে। পিতার আকস্মিক শোক সইতে না পেরে সামান্য রোগভোগের পর মাতাও ইহলোক ত্যাগ করেন।

পিতা-মাতার অবর্তমানে আমি হলাম নিতান্তই অসহায়। স্বাভাবিক ভাবেই মোসাহেবের দল চারদিক থেকে এসে ভিড় করতে লাগল আমার নবযৌবনের উপযোগী নানা রকম ইন্ধন যোগাতেও লাগল। আমার সর্বস্ব খুইয়ে অচিরেই আমি পথের ভিখারী হয়ে পড়লাম। লজ্জায়, ঘৃণায় ও অনুশোচনায় আমি অহর্নিশি দগ্ধে মরতে লাগলাম। টাকাকড়ির সঙ্গে আমার হিতৈষী মোসাহেব বন্ধুরাও গা ঢাকা দিল। অনন্যোপায় হয়ে ভাবলাম, মৃত্যুই আমার একমাত্র অবলম্বন, দ্বিতীয় কোন পথ আমার জন্য খোলা নেই। পরমুহূর্তেই ভাবলাম মৃত্যু চিন্তা তো কাপুরুষের কাজ।

আমাকে উন্নতি করতেই হবে আবার নতুন করে আমাকে প্রতিষ্ঠা অর্জন করতেই হবে। এ রকম চিন্তা করে আমি বসোরা ত্যাগ করি।

দেশত্যাগী হয়ে আমি অর্থের উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ভাবলাম, শুনেছি পিতা নাকি কায়রো শহর থেকে প্রভুত অর্থ উপার্জন করেছিলেন। যাই না, সেখানে গিয়ে দেখি, আমিও যদি অর্থের সন্ধান পাই। অমানুষিক পরিশ্রম করে এক সময় কায়রো নগরে পদার্পণ করলাম। সেখানে পৌঁছেই মনটা বিষিয়ে উঠল— ভাবলাম এই নগরেই আমার পূর্বপুরুষরা ব্যবসা করে প্রভুত বিত্ত উপার্জন করেছিলেন। আর আজ আমি ভিখারীর মত পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

বিষণ্ণ মনে রাজবাড়ীর পাশের রাস্তা ধরে হাঁটছিলাম। রাজ-প্রাসাদের সামনে গিয়ে হঠাৎ আমার দৃষ্টি প্রাসাদের জানালার দিকে গেল। সেখানে এক অপরূপ সুন্দরী যুবতী দাঁড়িয়েছিল; রূপের আভায় চোখ ঝলসে যাবার উপক্রম। কিছুতেই দৃষ্টি ফেবাতে পারছিলাম না। আমাকে নির্ণিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখে হঠাৎ যুবতীটি অদৃশ্য হয়ে গেল। আমি তখনও বিমূঢ়ের মত তাকিয়েই ছিলাম। ভাবছি যুবতী যদি আবার জানালায় এসে দাঁড়ায় তবে আর একবারটি দেখে মানবজীবন ধন্য করব। কিন্তু আমার আশা সফল হয়নি।

সূর্যপাটে বসল। আকাশে শেষ রক্তিম আভাটুকু মিলিয়ে গিয়ে এক সময় সন্ধ্যা ঘনিয়ে রাত্রি নেমে এল। হতাশ মনে ঘুরতে ঘুরতে এই সরাইখানায় গিয়ে আশ্রয় নিলাম। সামান্য আহারে উপোষ ভঙ্গ করে ক্লান্তদেহে সরাইখানার চৌপায়ায় শরীর এলিয়ে দিতেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে এল। যতোবারই ঘুমোতে চেষ্টা করি বারবারই সেই রূপসী যুবতীর মুখটি চোখের সামনে ছায়াছবির মত ভেসে উঠতে লাগল। উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার মধ্যে শুয়ে বসে দুর্ভাবনায় রাত্রির অবসান হ'ল। সকাল হ'ল। সকাল হ'তে না

হ'তেই কোন রকমে চোখ-মুখে জলের ছিটা দিয়ে আবার সেই প্রাসাদের কাছে গিয়ে নির্ণিমেষ চোখে জানালার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। নিষ্ফল প্রয়াস। ব্যর্থ হ'য়ে মনের দুঃখে সরাইখানায় ফিরে আসতে হ'লে। সে রাত্রিও উৎকণ্ঠার মধ্যে কাটল।

সকাল হ'লে আবার সেই পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে জানালার দিকে সতৃষ্ণ চোখে তাকিয়ে থাকলাম। সূর্যটা গড়াতে গড়াতে এক সময় মাথার উপরে উঠে এল। সূর্যের প্রখর তেজে গায়ে জ্বালা ধরে যাবার উপক্রম। আমার কিন্তু ভ্রূক্ষেপ মাত্র ছিল না। থালার মত রক্তবর্ণ সূর্যটা এক সময় পশ্চিম আকাশের গায়ে হামাগুড়ি দিতে দিতে দূরের গাছের আড়ালে এক সময় নিঃশেষে মিলিয়ে গেল। পৃথিবীর বুকে নেমে এল সন্ধ্যার অন্ধকার। আবার সেই সরাইখানা, চৌপায়ায় আশ্রয় করে নির্ঘুম রাত্রি যাপন। বার বার আশাহত হলেও পুরোপুরি আশা ছাড়তে পারলাম না। সকাল হলে ব্যাকুল মন আমাকে আবার টেনে নিয়ে গেল সেই জানালার ধারে। আবার সেই অসীম ধৈর্যের সঙ্গে আবার প্রতীক্ষার পরীক্ষা দিতে লাগলাম। ক্ষীণ আশার আলো দেখা দিল। ধীর পদক্ষেপে যুবতী আর রূপের ডালি নিয়ে খোলা জানালায় এসে দাঁড়াল। আমাকে লজ্জা করে সুমিষ্টকণ্ঠ থেকে কথা কটা বেরিয়ে এল—তুমি তো আচ্ছা লোক দেখছি। তোমার প্রাণে কি সামান্যতম ভয়ও নেই? তুমি কি জান না ঐখানে দাঁড়ানোর ব্যাপারে সম্রাটের কঠোর নিষেধ রয়েছে? অথচ তুমি ঘণ্টার পর ঘণ্টা জানালার দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাক! যদি প্রাণে বাঁচার সাধ থাকে এখান থেকে সরে পড়, নইলে রক্ষীরা এসে তোমার গর্দান নামিয়ে দেবে।

যুবতীর কথার জবাব দিতে গিয়ে বললাম—সুন্দরি, অপরাধ নিয়ো না। আমি নবাগত, সম্রাটের আদেশ জানা ছিল না। নির্দ্বিধায় অপরাধ স্বীকার করে নিচ্ছি। একটা কথা প্রথম দর্শনেই তোমাকে আমার মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি। তোমাকে যদি না-ই পাই, এ জীবন থাকা না-থাকা, দু-ই আমার কাছে সমান।

ক্রোধ প্রকাশ করে যুবতী বলল—ঠিক আছে, নিষেধ যখন শুনলে না, প্রহরীকে ডেকে দিচ্ছি। কথা কটা আমায় ছুঁড়ে দিয়ে যুবতী চকিতে চলে গেল। আমি সেই মুহূর্তে অনিশ্চিত ভয়-ভীতিতে কেমন যেন মিইয়ে গেলাম। ভাবলাম যুবতী বুঝি সত্যি সত্যিই প্রহরী ডাকতে গেল। প্রাণভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত মনে গুটিগুটি সেখান থেকে সরে পড়লাম। ফিরে এলাম সরাইখানায়। আবার সেই নিদারুণ অস্বস্তির মধ্যে রাত্রি কাটাতে হ'ল।

সকাল হলে আমার বাঁধনহারা মন আমাকে আবার টেনে নিয়ে গেল সেই রূপসী যুবতীর দর্শনাকাঙ্ক্ষায়। আবার সেই নিরবিচ্ছিন্ন উৎকণ্ঠা নিয়ে অধীর প্রতীক্ষা। বেশ কিছুক্ষণ পরে যুবতীর দেখা পেলাম। সেই ক্রোধোন্মত্তা রূপ। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে এসে ভর করেছে। আবার সেই কণ্ঠস্বর—নির্লজ্জ বেকুব কোথাকার! কাল না তোমাকে এখানে দাঁড়াতে নিষেধ করে দিয়েছি। আজ আবার এসেছ? তোমার কি প্রাণের মায়াও নেই? যদি মঙ্গল চাও, প্রাণ নিয়ে সরে পড়। প্রহরীরা এল বলে। এখানে তোমাকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলে ধড়ে আর মাথা থাকবে না।

আমি নিবেদন করলাম—সুন্দরি, তোমার চোখ ধাঁধানো রূপ আমাকে পাগল করেছে। কিন্তু তোমার হৃদয় এমন কঠোর, এমন পাষাণ যে আমার অবস্থা দেখে তোমার মধ্যে এতটুকুও করুণার উদ্রেক হচ্ছে না। আমার মানসিক পরিস্থিতি যদি বিন্দুমাত্র বুঝতে পারতে তবে এ-কথা মুখেও উচ্চারণ করতে না। জীবনের ভয় আমার নেই। তোমাকে যদি না-ই পাই কি হবে এ জীবন রেখে! তোমাকে ছাড়া বাঁচা মরা দুই-ই সমান। তুমি বরং প্রহরীকে ডেকে দাও, এ ছাড়া জীবন তোমার চোখের সামনে বিসর্জন দিই।

আমার কথায় যুবতীর মনে বিস্ময়ের সঞ্চার হ'ল। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বলল—এত বড় প্রতিজ্ঞা করে বসেছ! যাক, এক-

কাজ করবে, আজ মধ্যরাত্রে এখানে এসে দাঁড়াবে।—কথা কটা এক নিঃশ্বাসে আমার দিকে ছুঁড়ে দিয়ে চোখের পলকে যুবতীটি অদৃশ্য হয়ে গেল।

যুবতীর কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হলাম। উৎফুল্ল চিত্তে সরাইখানায় এসে হাজির হলাম।

রাত্রি গভীর হ'লে চুপি চুপি সরাইখানা থেকে বেরিয়ে সেই জানালার ধারে যেতেই থমকে দাঁড়ালাম। জানালা থেকে একটা দড়ি নীচে ঝুলতে দেখতে পেলাম। বুঝতে দেরী হল না আমার হৃদয়েশ্বরীর আহ্বান সঙ্কেত। মুহূর্তমাত্র দেরী না করে তড়িৎ-গতিতে দড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। দু'টো ঘর পেরিয়ে তৃতীয় ঘরে পা দিলাম। সুসজ্জিত ঘর। দেখলাম দুগ্ধফেন-শয্যায় যুবতী বসে আছে। ঠোঁটে মুচকি হাসির রেখা। যুবতীকে এত কাছ থেকে দেখার সৌভাগ্য ইতিপূর্বে আমার হয়নি। যুবতীর দেহে যৌবনের ঢল নেমেছে। বেশীক্ষণ এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকায় দেহ মনে অদ্ভূত একটা শিহরণ অনুভব করলাম।

যুবতী ঠোঁটের কোণে তেমনি হাসির রেখাটুকু বজায় রেখে ছোট্ট করে জিজ্ঞেস করল—কে তুমি? কোথায় তোমার বাস?

আমি বিন্দুমাত্র গোপন না করে আমার দুঃখের কাহিনী আমার প্রাণেশ্বরীর সামনে তুলে ধরলাম।

আমার কথায় যুবতীর মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল।

সামান্য সরে আমাকে বসতে বলল। সামান্য ইতঃস্ততের পর আমি তার নরম বিছানার এক কোণে গুটিসুটি হ'য়ে বসলাম।

যুবতী তার আবেশ জড়ানো চোখ দুটি আমার দিকে তুলে ধরে আবেগ ভরে উচ্চারণ করল—হে বিদেশী তুমি যেমন আমাকে দেখে মুগ্ধ হয়েছ, আমিও তেমনি প্রথম দর্শনেই তোমাকে মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি। তোমার কাহিনী আমাকে শোনালে, আমারও উচিত আমার কথা তোমাকে বলা।

দার্দেনির কথা

যুবতী তার রূপ-যৌবনের ডালিকে সামান্য আন্দোলিত করে একটু নড়েচড়ে বসে তার জীবন কথা শুরু করল—শোন আমার নাম দার্দেনি। দামাস্কা নগরের সুলতানের উজির ছিলেন আমার পিতা। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ, সজ্জন ও চরিত্রবান পুরুষ। নিজ প্রভুর প্রতি তাঁর মনে অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা ছিল, আর প্রজাদের প্রতি ছিল খুবই স্নেহ-মায়া-মমতা। প্রজারাও তাঁকে খুবই শ্রদ্ধা করত। মানুষের ভাগ্যচাকা ঘুরপাক খায়, চিরদিন সমান যায় না। স্বয়ং সুলতান থেকে শুরু করে এমনকি প্রজারা পর্যন্ত আমার পিতাকে স্নেহ ভক্তি করত দেখে কয়েকজন ঈর্ষা-পরায়ণ ব্যক্তি গাত্রদাহে জর্জরিত হতে লাগল। তারা প্রতিদিন সুলতানের কাছে আমার পিতার বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘটনা সাজিয়ে নানাভাবে দোষী করার চেষ্টা করতে লাগল। সুলতান শেষ পর্যন্ত ধূর্ত সভাসদদের কথায় বিশ্বাসী হয়ে আমার পিতাকে নির্বাসনদণ্ড দিলেন। আমি তখন মাত্র কয়েক বছরের শিশুমাত্র।

আমার পিতা অনন্যোপায় হয়ে স্বদেশ পরিত্যাগ করলেন। অন্যত্র গিয়ে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিলেন। আমার শিক্ষার জন্য তিনি নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার শিক্ষালাভ হ'ল না তাঁর অকাল মৃত্যুর জন্য। আমার মায়ের স্বভাব ভাল ছিল না। পরপুরুষের প্রতি তার খুবই আসক্তি ছিল। আমাকে এক মহাজনের কাছে বিক্রি করে দিয়ে তিনি উপপতির সঙ্গে অন্যত্র চলে গেলেন।

সেই মহাজন অন্যান্য যুবতীদের সঙ্গে আমাকেও হাটে নিয়ে পসরা সাজিয়ে বসলেন। দেশের সুলতান হাটে নারী ক্রয় করতে এসে আমার রূপ-লাবণ্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে প্রচুর ধনরত্নের বিনিময়ে আমাকে কিনে নিলেন। অন্তপুরের একটি ঘর আমার বসবাসের জন্য নির্ধারণ করে দিলেন। কয়েকজন দাসদাসীও আমার সেবা-যত্নের জন্য নিযুক্ত করলেন।

সুলতান আমার রূপে পাগলপারা। একদিন আমার ঘরে এসে বিনীতভাবে ব্যক্ত করলেন—সুন্দরী, তোমার রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি তোমাকে নিজের করে পেতে চাই। আমার প্রতি সদয় হও, তুমি আমার হও।

আমি সুলতানের কথায় প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললাম—জাহাপনা কেন আমাকে মিছে মিছি দুঃখ দিচ্ছেন। আমি সামান্য নারী, আপনার পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্তা।

সুলতান কিন্তু আমার আচরণে মোটেই ক্রোধ প্রকাশ করলেন না, বরং আমাকে অবাক করে দিয়ে দিন দিন আমার প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন করতে লাগলেন। সুলতানের আচরণে সুলতান মহিষিগণ আমার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হলেন। তাঁরা ষড়যন্ত্র করতে লাগলেন কি করে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেওয়া যায়। আমি প্রতিটি মুহূর্ত অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রেখে চলতে লাগলাম। আমার সতর্কতা অবলম্বনের ফলে তাদের পক্ষে আমার প্রাণনাশ করা সম্ভব হ'ল না।

সুলতান ছিলেন যথার্থই সুপুরুষ এবং প্রেমের পূজারী। আমি কিন্তু এতকিছু সত্বেও সুলতানের প্রতি অনুরক্ত হতে পারিনি। বিধির কী বিচিত্র বিধান! তোমাকে প্রথম দর্শনের দিনই তোমার চরণে এই অভাগিনীর মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছি। তোমার কাছে আমার একটাই বিনীত অনুরোধ, তোমার ভালবাসা থেকে যেন মুহূর্তের জন্যও আমাকে বঞ্চিত করো না।

যুবতীর কথায় আমার প্রেম-পাগল মনে অদ্ভুত একটা রোমাঞ্চ

অনুভব করলাম। তার মায়া-কাজল মাখানো চোখ দুটির দিকে তাকিয়ে আবেগের সঙ্গে উচ্চারণ করলাম—প্রেয়সী, আজ থেকে আমি তোমার চরণের দাস হ'লাম। আমার একটাই মিনতি, কোনদিন আমাকে অবজ্ঞা করো না।

কি করে যে আমার প্রথম প্রেমের রাত্রিটুকু কেটে গেল বুঝতেই পারি নি। শেষ রাত্রির দিকে আমরা উভয়েই কেমন যেন অবসাদ-গ্রস্ত হ'য়ে পড়লাম। ক্লান্তিতে চোখের পাতা জড়িয়ে আসছিল। বুঝলাম প্রেয়সীর একটু বিশ্রাম প্রয়োজন। বাধ্য হয়েই শোয়ার ব্যবস্থা করছিলাম। এমন সময় ঘটল অঘটন! বাইরে থেকে কে যেন দরজায় করাঘাত করছে। প্রথমে ভাবলাম মনের ভুল। উৎকর্ণ হয়ে ব্যাপারটা উপলব্ধি করার চেষ্টা করলাম। হ্যাঁ, করাঘাতই বটে। কে যেন ঘন ঘন করাঘাত করছে, আর চিৎকার করে বলছে—দরজা খোল, দরজা খোল!

দার্দেনি প্রমাদ গুণল! ভয়-বিহ্বল চোখ দু'টো মেলে আমার দিকে তাকাল—কেলেঙ্কারী ঘটতে চলেছে! সুলতানের কণ্ঠস্বর! আর রক্ষা নেই, এক্ষুণি আমাদের কোতল করবে!

সুলতানের কথা কানে যেতেই আমার অন্তরাত্মা খাঁচাছাড়া হবার উপক্রম। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হ'য়ে স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে থাকলাম। পালাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।

আবার সুলতানের তর্জন-গর্জন কানে এল—এখনও বলছি দরজা খোল! যদি প্রাণে বাঁচার ইচ্ছা থাকে দরজা খোল বলছি।

দার্দেনি নিরুপায় আমাকে খাটের তলায় ঢুকিয়ে দিয়ে কাঁপা কাঁপা হাতদুটো দিয়ে কোনরকমে দরজার ছিটকিনি খুলে ভীত-সন্ত্রস্ত মুখে দরজার একপাশে দাঁড়িয়ে থাকল।

ক্রোধোন্মত্ত সুলতান কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ম তরবারি হাতে আস্ফালন করতে করতে ঘরে ঢুকলেন—দুশ্চরিত্রা রমণী, বল কাকে ঘরে ঢুকিয়েছিস? কার সঙ্গে প্রেমালাপে এতক্ষণ মজেছিলি?

এতদিনে ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হল। কেন আমাকে বার বার প্রত্যাখ্যান করেছিস। প্রাণের দোসরটিকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছিস, ভাল চাস তো বল।

সুলতানের সঙ্গে কয়েকজন খোজা প্রহরী মশাল হাতে সেখানে উপস্থিত ছিল। সুলতান তাদের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন—'সং-এর মত হাঁ করে তাকিয়ে কি দেখছিস ? যা—কোথায় দুরাত্মা ঘাপটি মেরে রয়েছে, টেনে বের কর।

খোজা প্রহরীরা সুলতানের আদেশ পালন করতে গিয়ে হন্যে হ'য়ে চারিদিকে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। শেষ পর্যন্ত আমাকে খাটের তলা থেকে টানাটানি করে বের করে আনল। আমার অবস্থা তখন প্রাণে মরা। কণ্ঠনালীর কাছে আত্মাটা কোন রকমে আটকে রয়েছে এই মাত্র।

আমাকে দেখেই সুলতান সক্রোধে গর্জে উঠলেন—ওরে দুশ্চরিত্র পাপী! তোর পাপ পূর্ণ করতে শেষ পর্যন্ত বাঘের থাবায় এসে হাজির হয়েছিস! আমার মান-সম্ভ্রম নষ্ট করতে তোর আত্মাটা এতটুকু কাঁপল না! তোর পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য তৈরী হ।

কথা কটা শেষ করতে না করতেই সুলতানের হাতের তরবারি ঝিলিক মেরে উঠল। মাথার ওপর সুতীক্ষ্ম তরবারি তুলে আমাকে দ্বিখণ্ডিত করতে যাবেন, হঠাৎ এক অভাবনীয় কাণ্ড ঘটে গেল। এক অশীতিপরা বৃদ্ধা চিৎকার করে সুলতানের তরবারির সামনে এসে দাঁড়াল—জাঁহাপনা এ কী করছেন আপনি। এই পাপীর প্রাণনাশ করতে গিয়ে আপনার পবিত্র হাত কলুষিত করবেন! তাছাড়া শুধু এর দোষ দিয়ে কি হ'বে। এরা উভয়েই এক পাপ-কার্যে লিপ্ত, শাস্তি উভয়েরই হওয়া উচিত। আমার কথা শুনুন, দু'জনকেই সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করুন। কুমির ও হাঙরে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ক্ষিদে মেটাক, তিলে তিলে দগ্ধে মরুক।

বৃদ্ধার কথায় সুলতান তরবারি সংযত করলেন। প্রহরীদের নির্দেশ দিলেন আমাদের দু'জনকেই বেঁধে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করতে। প্রহরীরা সুলতানের আদেশ পালন করল। প্রাসাদ চূড়া থেকে আমাদেয় সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করল।

আমি দেহে যথেষ্ট শক্তি ধরি, সাঁতারেও কম পটু নই। সামান্য চেষ্টা করতেই দেহের বাঁধন খুলে গেল। প্রাণপণে উন্মত্ত সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কোনরকমে তীরে এসে উঠলাম। হঠাৎ দার্দেনির অসহায় অবস্থার কথা মনে পড়তেই দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে আবার সমুদ্রে ঝাঁপ দিলাম। বৃথা চেষ্টা। দার্দেনিকে ফিরে পেলাম না, ভগ্ন হৃদয়ে আবার তীরে ফিরে এলাম। নিজেকে সান্তনা দেবার ভাষা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। বার বার মনে হ'তে লাগল. আমিই ভাগ্যহীনার মৃত্যুর কারণ। নিজের অজান্তে দু'চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল।

দার্দেনিকে হারিয়ে আমি উদভ্রান্তের মত হ'য়ে পড়লাম। মনে জমাট বাধা ব্যথা-বেদনা নিয়ে কায়রো নগর ত্যাগ করে বোগদাদের দিকে যাত্রা করলাম। দার্দেনিকে ভোলা সম্ভব নয়। যত চেষ্টা করি মনকে হালকা করতে, বার বারই তার সেই অসহায় মুখটি চোখের সামনে ফুটে ওঠে।

দিনের পর দিন হেঁটে ক্লান্ত-অবসন্ন শরীরে এক পাহাড়ের পাদদেশে হাজির হলাম। পাহাড়টি অনুচ্চ হলেও খুবই জঙ্গলাকীর্ণ। ওটাকে অতিক্রম করার চেষ্টা না করে এক ঝর্ণার ধারে সমতল পাথরের ওপর রাত্রি কাটানো মনস্থ করলাম। শরীর ও মন দুই-ই দুর্বল। বুকে হতাশার শকুনির দৌরাত্ম। আমার অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ ও দার্দেনির কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে একটু তন্দ্রাভাব এসেছিল বুঝতে পারিনি। রাত্রি তখন তৃতীয় প্রহর হবে হয়ত। হঠাৎ এক রমণী-কণ্ঠের কাতর আর্তনাদে তন্দ্রা ভেঙে সোজা হয়ে বসলাম। দূরাগত করুণ স্বরটা যে কোন দিক থেকে ভেসে আসছে প্রথমটায় বুঝে উঠতে পারিনি। নীরবে

উৎকর্ণ হ'য়ে ওটাকে লক্ষ্য করতে চেষ্টা করলাম। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার সেই আর্তনাদ! কেমন যেন অস্থির-চঞ্চল হ'য়ে পড়লাম। আর্তস্বর লক্ষ্য করে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে দেখি, এক বৃদ্ধ গর্ত খুঁড়ছে। গর্ত খোঁড়া শেষ হলে একটা কাঠের বাক্স টানাটানি করে কাছে নিয়ে এল। অনেক কষ্টে সেটাকে গর্তের মধ্যে নামিয়ে মাটি চাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি চলে গেল। আমি একটা গাছের আড়াল থেকে নিঃশব্দে ব্যাপারটা লক্ষ্য করছিলাম।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পাখির ডাকে সকাল হ'ল। আমি গর্তের কাছে এসে মাটি সরিয়ে কাঠের বাক্সটা বের করলাম। ব্যস্ত হয়ে ডালাটা খুলতেই আমার সর্বাঙ্গ থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল। রক্ত চলাচল দ্রুততর হ'ল। এক রূপসী যুবতী রক্তে মাখামাখি হয়ে বাক্সের মধ্যে পড়ে রয়েছে। আত্মাটা তখনও দেহ আশ্রয় করে রয়েছে। অস্ত্রের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত দেহটাকে টেনে বাক্সের বাইরে বের করে আনলাম। ক্ষতস্থান দিয়ে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছেদ দেখে মনে হ'ল নিশ্চয়ই কোন ভাগ্যাহতা রাজ-কন্যা। আমি ভয়ে ভয়ে যুবতীর মুখের কাপড় সরাতেই সে রীতিমত করুণ স্বরে আর্তনাদ করে উঠল—দয়া কর, আমাকে আর মেরো না! আমি আর সইতে পারছি না, একটু দয়া কর, আমাকে বাঁচতে দাও! মেরো না……আর মেরো না!

আমি তাকে অভয় দিতে গিয়ে শ্লেষ্মা জড়িত ভাঙা ভাঙা গলায় উচ্চারণ করলাম—'তোমার ভয় নেই, তোমাকে মারতে নয়, বাঁচাতেই চাই। পরম দয়াময়ের ইচ্ছায় আমি এখানে হাজির হয়েছি। নইলে এই নির্জন-নিরালা পার্বত্য জঙ্গলে আমিই বা কেন রাত্রি কাটাতে আসব বল? তুমি শান্ত হও, বল তো কে এই পাষণ্ড যে তোমার মত একটা রূপসীর দেহে অস্ত্র চালাতে ইতস্তত করেনি?

যুবতী ক্ষীণকণ্ঠে উচ্চারণ করল—আমি জানি না আপনি কে? ঈশ্বরের কাছে আপনার মঙ্গল কামনা করছি। অনুগ্রহ করে একটু জল দিয়ে আমার আত্মাটাকে রক্ষা করুন।

আমি ছুটে গিয়ে ঝর্ণার জলে আমার জামাটা ভিজিয়ে এনে যুবতীর তৃষ্ণার্ত আত্মাটা তৃপ্ত করলাম।

কয়েক মুহূর্ত নীরবে কাটিয়ে যুবতী আবার মুখ খুলল—মহাশয়, আমার শরীর থেকে যেভাবে রক্তক্ষরণ হচ্ছে, আমি হয়ত আর বেশীক্ষণ বাঁচব না।

আমি তার কথার জবাব দিয়ে বৃথা কালক্ষয় না করে তাড়াতাড়ি জামাটা ছিঁড়ে তার ক্ষতস্থানগুলো জড়িয়ে রক্তক্ষরণ বন্ধ করলাম। আর এক ঢোক জলপান ক'রে যুবতী যেন আত্মাটা ফিরে পেল। অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার স্বরে বলল—জানি না, আপনি কে? আপনার নামধাম বংশ পরিচয় কিছুই আমার জানা নেই। স্বীকার করতে দোষ নেই, আপনার অশেষ করুণাই আমাকে জীবন ফিরিয়ে দিয়েছে, আপনার ঋণ অপরিশোধ্য। এখন আমার একটাই প্রার্থনা, যে ভাবেই হোক আমাকে লোকালয়ে নিয়ে চলুন। আমাকে সম্পূর্ণ সুস্থ করে তোলার ব্যবস্থা করুন।

আমি সহৃদয়তার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম—সুন্দরি, কে তুমি? কার কন্যা তুমি? তোমার কে কে আছে জানিয়ে আমাকে কৌতূহল মুক্ত কর।

যুবতী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—সে অনেক কথা তবে এটুকু বলতে পারি, আপনার ভয়ের কোনই কারণ নেই। পথে কেউ জিজ্ঞেস করলে বলবেন, এ আমার বোন, পথে দস্যুর কবলে পড়ে এ দুর্দশা হয়েছে।

আমি আহত যুবতীকে নিয়ে এক সরাইখানায় গিয়ে উঠলাম। সরাইখানার কর্মাধ্যকে বললাম—দেখুন মশায়, দস্যুর কবলে পড়ে আমাদের এ-দুর্গতি। আমাদের যা কিছু ছিল সবই ওরা ছিনিয়ে নিয়েছে। আমার বোনের এখনও ক্ষীণ জীবনের আশা রয়েছে, অনুগ্রহ করে আশ্রয় দিলে হয়ত শুশ্রূষার দ্বারা সুস্থ করে তুলতে পারব।

আমার কাতর প্রার্থনায় কর্মাধ্যক্ষের মনে দয়ার সঞ্চার হ'ল।

তাঁর অনুগ্রহে আশ্রয় পেয়েগেলাম। এবার সাহসে ভর করে দ্বিতীয় নিবেদন রাখলাম—আর একটা কথা, আমরা বিদেশী, এখানে কাউকেই চিনি না। অনুগ্রহ করে একজন ভাল চিকিৎসকের সন্ধান দিলে খুবই উপকার হয়।

কর্মাধ্যক্ষ আমাকে আশ্বাস দিয়ে চিকিৎসকের সন্ধানে বেরোলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই একজন চিকিৎসককে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এলেন। অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাসাধিক কাল কঠোর পরিশ্রম করে যুবতীটিকে সুস্থ করে তুললেন।

রোগ নিরাময় হলে যুবতীটি একদিন আমার হাতে একটি চিঠি দিয়ে বলল—এই নগরের শেষে মাহীর নামে এক সওদাগর রয়েছেন তাঁকে এটা দিয়ে আসবেন।

সওদাগর আমার হাত থেকে যুবতীর প্রদত্ত পত্রটিপাঠ করে আমার হাতে বেশ কিছু সংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন যুবতীকে দেবার জন্য।

মুদ্রাগুলো হাতে পেয়ে যুবতীর তো মহা উল্লাস! আমাকে বলল, একটি বেশ বড়সড় ও ভাল বাড়ি কেনার ব্যবস্থা করতে!

সুন্দর একটি প্রাসাদ তুল্য বাড়ি কেনা হল। সরাইখানার অধ্যক্ষকে তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে আমরা সদ্য ক্রয়করা বাড়িতে উঠে এলাম।

কিছুদিন পর আবার আর একটি চিঠি আমার হাতে ধরিয়ে দিয়ে সেই সওদাগরের কাছে যেতে বলল। চিঠির বক্তব্য পড়ে তিনি এবার কিছু স্বর্ণ মুদ্রা আমার হাতে তুলে দিলেন।

যুবতীর নির্দেশে সেই স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে কিছু অত্যাবশ্যক জিনিস, মূল্যবান কাপড়-চোপড় এবং জনাকয়েক দাস-দাসী কিনে আনলাম। সেই চিঠি, সওদাগর এবং স্বর্ণ মুদ্রার ব্যাপারটি কিন্তু আমার কাছে রহস্যময় থেকে গেল। কৌতূহল হয়ে যুবতীকে জিজ্ঞেস করি কে এই সওদাগর, তাঁর সম্বন্ধই বা কি? কিন্তু বলি বলি করেও কথাটা আর তার কাছে পাড়া হ'য়ে ওঠে নি। যুবতীর বিশেষ অনুরোধে আমাকে আরও কিছুদিন তার বড় ভাই সেজে থাকতে হ'ল।

এক সকালে যুবতী আমার হাতে কিছু স্বর্ণ মুদ্রা দিয়ে বলল —স্থানীয় বাজারে নামারণ নামে এক বণিকের দোকান রয়েছে, সেখান থেকে এই ফর্দ মিলিয়ে কাপড়-চোপড় কিনে আন। একটা কথা স্মরণ রাখবে, সে কাপড়ের দাম যা চাইবে তাই দিয়ে দেবে। ভুলেও কোন রকম দর কষাকষি করবে না।

ঘাড় বাঁকিয়ে যুবতীর কাছ থেকে বিদায় নিলাম বটে, কিন্তু দর-কষাকষি করতে নিষেধ করার রহস্যটা বুঝতে পারলাম না। যাই হোক যুবতীর নির্দেশে বণিক নামারণ যা চাইল, পাইপয়সা পর্যন্ত মিটিয়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে এলাম।

কয়েকদিন নতুন কিছু ঘটল না। তিনদিন পরে যুবতী আবার আমার হাতে কিছু স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে সেই বণিকের কাছ থেকে কাপড় কিনে আনতে পাঠাল। এবারেও সেই রকমই নির্দেশ—যেন কাপড়ের দাম নিয়ে কোন রকম দরাদরি না করি। আমিও ফর্দ অনুযায়ী কাপড় মিলিয়ে নিয়ে কোন রকম দরদস্তুর না করে বণিকের কাছ থেকে কাপড় নিয়ে ফিরে আসছিলাম। আমার সরল ব্যবহারে বণিক খুবই বিস্মিত ও আনন্দিত হয়ে বললেন—

মহাশয়, আগামীকাল যদি এই দীন-হীনের ঘরে সামান্য আহারাদি করেন, এই অধম ধন্য হবে।

আমি উচ্ছ্বসিত আবেগের সঙ্গে বণিকের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলাম। কাপড় নিয়ে বাড়ি ফিরে যুবতীকে বণিকের নিমন্ত্রণের কথা বললাম। ব্যাপারটা শুনে যুবতীও উল্লাস প্রকাশ করলেন। আমাকে উৎসাহিত করতে গিয়ে বললেন—ভদ্রলোক যখন মুখ ফুটে অনুরোধ করছেন, যাওয়াই উচিত। তবে হ্যাঁ আহারান্তে আপনিও তাঁকে নিমন্ত্রণ করে আসবেন। যুবতীর কথায় এবং তাঁর আচার-আচরণে মনে কেমন সন্দেহ হ'ল। ভাবলাম এর পিছনে কোন গোপন অভিসন্ধি লুকিয়ে নেই তো। কৌতূহল গোপনই রাখলাম।

পরদিন যথারীতি নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর

কাছেও আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দেবার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ রাখলাম। ভদ্রলোকও আমার নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলেন না।

পরদিন সন্ধ্যায় বণিক আমাদের বাড়ি এলেন। আমি যথোচিত অভ্যর্থনা করে তাঁকে বসতে দিলাম। আহারান্তে ভদ্রলোক বিদায় নেবার পূর্বে যুবতী আমার হাতে সুরার পাত্র ধরিয়া দিয়ে বণিককে সুরাপানের জন্য অনুরোধ করতে বললেন। বণিকও মহা উল্লাসে আমার হাত থেকে সুরার পাত্রটি তুলে নিলেন। সুরা-পান, গলপগুজব এবং হাসিঠাট্টার মধ্য দিয়ে অনেক রাত্রি হয়ে গেল। তাছাড়া অধিক সুরাপানে বণিক খুবই কাহিল হ'য়ে পড়েছেন দেখলাম। অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে আমাদের বাড়িতে রাত্রিটুকু কাটিয়ে যেতে অনুরোধ করলাম।

আমার প্রস্তাবে বণিক সহজেই রাত্রিবাসে সম্মত হয়ে গেলেন। ওপরের একটি ঘরে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি নীচে আমার শোবার ঘরে চলে এলাম। নেশার ঘোরে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারি নি। ঠিক কতক্ষণ পরে হিসাব করে বলা মুস্কিল, এক সময় যুবতী ব্যস্ত হয়ে আমার ঘরে ছুটে এলেন। ডাকাডাকি করে আমাকে ঘুম থেকে তুলে বললেন—মহাশয় তাড়া-তাড়ি আসুন, আসুন বণিক নামারণের কী অবস্থা হয়েছে দেখবেন আসুন।

আমি ধড়ফড়িয়ে উঠে ছুটতে ছুটতে বণিকের ঘরের দরজায় পা দিয়েই থমকে দাঁড়ালাম। নিজের চোখ দুটোকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছিলাম না। দেখি হতভাগ্য বণিকের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ বিছানায় লুটোচ্ছে। আমি সভয়ে চিৎকার করে উঠলাম—রাক্ষসি! একি করেছিস তুই! লোকটা কী ক্ষতি করেছিল যার জন্য এমন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করলি। তোর জন্য আমিও অপরাধী হলাম।

আমাকে থামিয়ে দিতে গিয়ে যুবতী বলল—চীৎকার করবেন না, সংযত হোন। আপনার ভয়ের কিছু নেই। এই হতছাড়াটাকে যদি জানতেন তবে আমাকে এমন তিরস্কার করতেন না। এই

পাষণ্ডই আমাকে নিষ্ঠুরভাবে ক্ষতবিক্ষত করে কবরস্থ করেছিল। ঈশ্বরের অশেষ করুণা যে আমার সবচেয়ে বড় শত্রুকে হত্যা করতে পেরেছি। আমার অতীত কাহিনী শুনুন—মনের দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর হবে।

যুবতী মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দম নিয়ে বলতে শুরু করলেন—আমি এই দেশের সুলতানের একমাত্র কন্যা। আমার পত্র নিয়ে যাঁর কাছ থেকে বার বার স্বর্ণমুদ্রা নিয়ে এসেছিলেন, তিনি আমাদের কোষাধ্যক্ষ। এক বিকেলে আমাদের প্রাসাদের উদ্যানে ঘুরে বেড়ানোর সময় হঠাৎ মামারণকে দেখতে পেলাম। প্রথম দর্শনেই তার পেশীবহুল সুঠাম দেহ, গৌরবর্ণ দীর্ঘাকৃতি পুরুষোচিত দেহসৌষ্ঠব দেখেই আমি মনে মনে তাকে আত্মসমর্পণ করে বসলাম।

পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলাম যুবক নামারণ সামান্য একজন বণিক মাত্র। অথচ আমি সুলতানের একমাত্র কন্যা, তাই আমাদের প্রণয়-সম্পর্কের মধ্যে বিরাট একটা বাধার প্রাচীর সৃষ্টি হ'ল।

কিন্তু তার প্রেমে আমি এমনই মুগ্ধ হলাম, নিজেকে এমনভাবে জড়িয়ে ফেললাম যে সেখান থেকে সরে আসা আমার পক্ষে সাধ্যাতীত হয়ে পড়ল। প্রেম-রোগাক্রান্ত হয়ে আমি দিনদিন হৃতস্বাস্থ্য ও রুগ্ন হ'য়ে পড়তে লাগলাম। আমার দেহে কঠিন রোগ ভর করল। আমার ধাত্রী মা ছিলেন অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণা, আমাকে খুবই স্নেহ করতেন। বুদ্ধিমতী ও সুচতুরা মহিলাটি অনেক চেষ্টা-চরিত্র করে আমার রোগের কারণ জানতে পারলেন। তিনি একরাত্রে নামারণকে নারীবেশে আমার ঘরে নিয়ে এলেন। এবার প্রতি রাত্রেই সে আমার ঘরে রাত্রি কাটাতে লাগল। দিনের বেলায় ঘরের গোপন স্থানে তাকে লুকিয়ে রাখতাম।

কিছুদিন সুখভোগের পর সে আমার কাছ থেকে মাত্র দু'এক দিনের জন্য ছুটি নিয়ে নিজের বাড়ি গেল। এর পর থেকে নিজের বাড়িতেই থাকত। মাঝে মধ্যে রাত্রির অন্ধকারে চুপি চুপি

এসে আমাকে সঙ্গদান করে আবার গোপনে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যেত। এমনিভাবে আমাদের গোপন অভিসার চলতে লাগল। একদিন ভাবলাম সে তো প্রায়ই আমার বাড়িতে আসে, কিন্তু একদিন আমি যদি তার ঘরে যাই তবে হয়ত সে আরও বেশী সন্তুষ্ট হবে। এ-রকম চিন্তা করে এক রাত্রে গুটি গুটি নামারণের বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম। তার শোবার ঘরের দরজায় পা দিতেই শরীরের সব কটা স্নায়ু যেন একসঙ্গে সচকিত হয়ে উঠল। তার ঘরে নারী-কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে। উঁকি মারতেই আরও বিস্মিত হ'তে হ'ল। দেখি এক যুবতী নামারণের সঙ্গে সুরাপান করছে এবং হাসি-তামাশায় মত্ত। উন্মাদিনীর মত ঘরে ঢুকে যুবতীটির চুলের মুঠি ধরে হেঁচড়ে ঘর থেকে বের করে দিলাম।

এই শয়তান বণিক আমার পা দুটো জড়িয়ে ধরে মায়াকান্না জুড়ে দিল—প্রাণেশ্বরী, অপরাধ ক্ষমা কর। তোমার পা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করছি, ভবিষ্যতে আর এমন কুকর্ম করব না। তোমাকে ছাড়া অন্য কোন নারীর প্রতি আকৃষ্ট হ'ব না।

প্রেমিকের চোখের জল দেখে আমার মন গলে গেল। তাকে বুকে টেনে নিয়ে সব দোষ ক্ষমা করে দিলাম।

বণিক নামারণ আমার হাতে সুরার পাত্র তুলে দিয়ে বলল—প্রিয়ে তুমি অস্থির-চঞ্চল। সামান্য সুরাপান করলে তুমি সুস্থবোধ করবে।

আমিও সরল বিশ্বাসে সুরার পাত্র মুখে তুলে নিলাম। ঝোঁকের বশে সুরাপান মাত্রাতিরিক্ত হ'য়ে যাওয়ায় আমি নেশাগ্রস্ত হয়ে এলিয়ে পড়লাম। দুষ্ট বণিক সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে একটি ছুরি দিয়ে বার বার আমার শরীরে আঘাত করতে লাগল। আমি সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবতী আবার বলল—তার পরের কাহিনী আমার চেয়ে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন। তাই তাকে হত্যা করে প্রতিশোধ নিতে বাধ্য হলাম। আশা করি

এবার আমাকে আর অপরাধী বলবেন না। আপনার কাছে আমার একটা অনুরোধ, আমাকে আমাদের বাড়ী পেঁছে দিন। আমাকে কাছে পেয়ে আমার বাবা অবশ্যই খুবই আনন্দিত হবেন, আপনার ভাগ্যও এতে সুপ্রসন্ন হবে। আমার জীবন দানের জন্য আপনাকে প্রচুর ধনরত্ন দিয়ে পুরস্কৃত করবেন এবং যথোচিত আদর-আপ্যায়ন করবেন সন্দেহ নেই।

আমি তাঁর আমন্ত্রণ প্রত্যাখান করে বললাম—ধন-রত্নের প্রতি আমার লিপ্সা নেই। আমার শুধুমাত্র এইটুকুই আক্ষেপ—অহেতুক আমি নামারণের মৃত্যুর কারণ হলাম। আপনার উচিত ছিল সর্বাগ্রে ব্যাপারটা নিয়ে আমার সঙ্গে খোলাখুলি আলোচনা করা। প্রয়োজনবোধে তার অন্য কোন শাস্তির ব্যবস্থা করা যেত। যুবতীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেই নগর ছেড়ে চলে এলাম।

আবুল কাসেমের গুপ্তধন প্রাপ্তি

সুলতান-কন্যার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ এক বণিকের সঙ্গে দেখা হ'ল। বণিক কার্যোপলক্ষে বোগদাদ নগরে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। আমিও তাঁর পিছু নিলাম।

বণিকের সঙ্গে বোগদাদে হাজির হলাম। আমার কাছে তখন একটি মাত্র স্বর্ণমুদ্রা সম্বল। শেষ সম্বল ঐ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে কিছু প্রসাধন সামগ্রী কিনে লোকের দরজায় দরজায় ফেরি করতে লাগলাম। এভাবে ফেরি করতে করতে একদিন দেখলাম কয়েক-জন ভদ্রলোক কোন এক জায়গায় পানাহার করতে করতে খোস মেজাজে গল্পগুজব করছেন। আমি প্রতিদিন তাদের কাছে আমার গন্ধদ্রব্যাদি বিক্রি করতে লাগলাম। একদিন ওদের কাছ থেকে ফেরার সময় এক বৃদ্ধ আমাকে ডেকে বললেন—তুমি সবার কাছে কিছু না কিছু বিক্রি করলে, কিন্তু কই আমার কাছে কিছুই বিক্রি করলে না তো ?

আমি সসঙ্কোচে বললাম—কিছু মনে করবেন না, অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্য ক্ষমা করবেন। সবার পিছনে রয়েছেন বলে নজর এড়িয়ে গেছেন। বৃদ্ধ ফোকলা দাঁতে হেসে আমার ঝুড়ি থেকে একটি আতর তুলে নিয়ে আমার পরিচয় জানতে চাইলেন।

আমি তাকে বাধা দিয়ে বললাম—পরিচয় জিজ্ঞেস করে অনুগ্রহ করে আমাকে ব্যথা দেবেন না। আমার পূর্ব-স্মৃতি স্মরণ করতে চাইনে। বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমাকে আর ঘাঁটালেন না, আমার হাতে দশটি স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে লাঠি ভর দিয়ে চলে গেলেন।

বড়লোকের ব্যাপার-স্যাপার দেখে অবাক হতে হল। একটি মাত্র আতরের জন্য পুরো দশটি স্বর্ণমুদ্রা হাসিমুখে আমার হাতে গুঁজে দিলেন। বৃদ্ধ নিশ্চয়ই কোন আমির-ওমরাহ হবেন হয়ত!

পরের দিন সর্বাগ্রে বৃদ্ধটির সামনে ঝুড়ি রাখলাম। আগের দিনের মত সেদিনও একটি আতর তুলে নিয়ে দশটি স্বর্ণমুদ্রা আমার হাতে দিলেন। সেদিনও আমার পরিচয় জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। উপায়ান্তর না দেখে পরিচয় দিতেই হল। ভদ্রলোক তার নিস্তেজ চোখ দুটো আমার দিকে তুলে ধরে ছোট্ট করে হেসে বললেন—আমার অনুমান অভ্রান্ত। প্রথম দর্শনেই বুঝে নিয়েছিলাম, আমিজের পুত্র। তোমার বাবা আমার অভিন্নহৃদয় বন্ধু ছিলেন। এভাবে নিকৃষ্ট জীবন-যাপনের দরকার নেই, চল আমার সঙ্গে। একরকম জোর করেই আমাকে তাঁর বাড়ি নিয়ে গেলেন।

সহৃদয় পিতৃবন্ধু বৃদ্ধের আশ্রয়ে সুখেই আমার দিন কাটতে লাগল। কিছুদিন পর বাণিজ্য-পণ্যাদি বিক্রি হয়ে গেলে বাসারা নগরে ফিরে যাবার সময় আমাকেও সঙ্গে নিয়ে এলেন। আমার সৌভাগ্য দেখে আমার বন্ধু-বান্ধব ও আত্মীয়-পরিজনরা খুবই অবাক হ'ল। বৃদ্ধ বণিক আমাকে পোষ্যপুত্র রূপে গ্রহণ করলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন—আবুলকাসেম, তোমাকে পুত্ররূপে পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করি। আমিও তাঁকে পিতার ন্যায়ই সেবা-যত্ন করতে লাগলাম।

কয়েকদিনের মধ্যেই বণিক এক অদ্ভুত রকম কঠিন রোগাক্রান্ত হলেন। রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের জন্য বহু চিকিৎসক আনা হ'ল। চিকিৎসা ব্যর্থ হ'তে চলেছে অনুমান করে একদিন আমাকে কাছে ডেকে ফিসফিসিয়ে বললেন—স্পষ্ট বুঝতে পারছি আমার দিন ফুরিয়ে আসছে। তোমাকে একটি গোপন কথা বলে যেতে চাই, আমি যা কিছু উপার্জন করেছি তা-ই তোমার জীবন কাটানোর পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু তার চেয়ে শতগুণ আমার পৈতৃক ধন-সম্পদ মাটির নীচে লুকানো রয়েছে। যাবার আগে তোমাকে সব বলে যাচ্ছি, তবে প্রশ্ন কোরো না, এই অপরিচিত ধন কোত্থেকে এল আমার জানা নেই। আমার পিতামহ মৃত্যুকালে নাকি তাকে দিয়ে গেছেন। পিতার মৃত্যুর পর তা আমার হস্তগত হয়। আমার মৃত্যুর পর তোমার ওপরই ওগুলোর মালিকানা বর্তাবে। কথা শেষ করে তিনি একটি উইল আমার হাতে গুঁজে দিলেন। একটি কথা মনে রাখবে, একটি কাণাকড়িও যেন অপব্যয় করবে না, সৎ কাজে প্রতিদিন এর থেকে মুক্ত হস্তে দান করবে। এ-কাজ যে যশের কোন সন্দেহ নেই। তবে তোমার দান দেখে রাজা উজিরও ঈর্ষা করতে পারেন। ছলে-বলে-কৌশলে তোমার ওই ধন আত্মসাৎ করতে চেষ্টা করবে। তাই তুমিও আমার মতই বাণিজ্য করে সংসার যাত্রা নির্বাহ করবে। তবেই তুমি কারো সন্দেহভাজন হ'বে না, ধনরাশি ভোগ করতে পারবে।

আমি মৃত্যুপথযাত্রী বৃদ্ধকে কথা দিলাম—তাঁর উপদেশ অবশ্যই স্মরণ রাখব! বৃদ্ধ আমার ওপর সন্তুষ্ট হয়ে গুপ্ত-ধনাগারের স্থানটির কথা বলেই ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলেন।

বৃদ্ধের মৃত্যুর অব্যবহিত কাল পরে একদিন খোঁজ করতে করতে গুপ্তধনাগারে হাজির হলাম। ব্যাপার দেখে আমার তো চক্ষুস্থির। এত ধন একত্রে দেখা তো দূরের কথা ভাবতেও পারি নি। প্রতিদিন দুহাতে দান করলেও তার এক শ ভাগের এক ভাগও ফুরোবে না।

এই অপরিমিত ধন-সম্পদ হাতে পেয়ে ভাবলাম যদি দান ধ্যানই না করলাম তবে আর এগুলো থেকে কি লাভ। প্রতিদিন দীন-দুঃখীদের অকাতরে দান করতে শুরু করলাম।

আমি হঠাৎ এ-রকম দান-কর্ম শুরু করায় পুরবাসীরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা শুরু করল। আমার দানের কথা শুনে দেশের বিভিন্ন অংশ থেকে বহু অর্থলোভী, কৃপণ ও কুচরিত্র লোকেরাও এসে সাহায্য প্রার্থনা করতে লাগল।

একদিন এক ঘটনা ঘটল। নগররক্ষক এসে বললেন—শোনলাম তুমি নাকি প্রচুর গুপ্তধন পেয়েছ, ওগুলো কোথায় আছে বল। রাজার আদেশে আমাকে ছুটে আসতে হয়েছে। গুপ্তধন রাজারই প্রাপ্য হয়, আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

নগররক্ষকের কথায় আমার বুকের ভেতরটা হঠাৎ কেমন যেন মোচড় মেরে উঠল। সর্বনাশ হতে চলেছে! বৃদ্ধের আদেশ অগ্রাহ্য করায় এই বিপদে পড়েছি সন্দেহ নেই। আমার অবস্থা দেখে নগর-রক্ষক ধরেই নিয়েছেন, লোকমুখে যা শুনে এসেছেন তা অবশ্যই সত্য। আমার দুর্বলতার সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে ছাড়লেন না! মুচকি হেসে বললেন—আপনি চিন্তা করছেন কেন? আমি তো রয়েছি। গুপ্তধনের কিছু অংশ আমাকে দিন, সব ধামাচাপা পড়ে যাবে।

আমি উৎসাহ প্রকাশ করে বললাম—কত পেলে খুশি হন, বলুন?

লোকটি ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন—তুমি প্রতিদিন দশটি করে স্বর্ণমুদ্রা দিলেই আমি ব্যাপারটাকে আর বেশী ঘাঁটাব না।

নিজের স্বার্থের কথা চিন্তা করে তাঁর কথায় আমি সম্মত হলাম।

নগররক্ষক সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, আমার দ্বারা কোন অনিষ্ট হবে না। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছি, আপনার ধনভাণ্ডার অক্ষয় হোক। আপনার ছত্র-ছায়ায় দরিদ্র-অসহায় ব্যক্তিরা প্রতিপালিত হোক।

কিছুদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। একদিন সকালে উজির দূত

পাঠিয়ে আমাকে তলব করলেন। তাঁর তলবী পরোয়ানা পেয়ে ভয়ে ভয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তিনি বললেন—তুমি অনেক গুপ্তধন পেয়েছ শুনে সুখী হলাম। কিন্তু আইন অনুসারে এর এক পঞ্চমাংশ সুলতানের প্রাপ্য। কই, সুলতানের প্রাপ্য দাওনি তো! তাঁর প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে তুমি যাকে খুশি দান করতে পার। উজিরের মনোভাব বুঝতে পারলাম। তাঁকে বললাম—আমি গুপ্তধন পেয়েছি সত্য, কিন্তু আমার দেহে প্রাণ থাকতে তার সন্ধান কেউ পাবে না। তবে কথা দিচ্ছি আমার ওপর জোরজুলুম না হলে প্রতিদিন হাজার স্বর্ণমুদ্রা আপনাকে দিতে পারি।

স্বার্থগৃধ্নু উজির আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে গেলেন। আমার সঙ্গে একটি লোক দিলেন। আমি তাকে বাড়ী নিয়ে এলাম, একমাসের ত্রিশ হাজার স্বর্ণমুদ্রা পাঠিয়ে দিলাম। উজির তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করল না। আমার দেওয়া অর্থ আত্মসাৎ করে সুলতানের কানে গুপ্তধনের ব্যাপারটি তুললেন। সুলতানকে এ-কথাও বললেন—কাসেম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ গুপ্তধনের সন্ধান কাউকেই দেবে না। প্রাণ থাকতে নাকি গুপ্তধন কোথায় আছে বলবে না।

সুলতান উজিরের কথায় বিস্ময় ও ক্রোধ প্রকাশ করে আমাকে দূত পাঠিয়ে ডাকালেন। আমি ভয়ে ভয়ে সুলতানের দরবারে গেলাম। অতিশয় চতুর সুলতান মনের ক্রোধ গোপন রেখে মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে তুলে বললেন—দেখ যুবক, তোমার গুপ্তধন প্রাপ্তির খবর আমি জানি। আমার দিক থেকে তোমার ভয়ের কিছু নেই, বরং আমি তোমার দান-ধ্যানে সন্তুষ্ট। আমাকে নীচ ভেবো না, তোমার ধনভাণ্ডার দেখাতে ভয়ের কিছু নেই। তুমি নির্দ্বিধায় আমাকে তোমার ধনভাণ্ডার দেখাতে পার।

আমি হাত কচলে নিবেদন করলাম—জাঁহাপনা, আপনি দেশের সুলতান, আপনাকে অমান্য করার স্পর্ধা আমার নেই। অধীনের একটাই নিবেদন—অনুগ্রহ করে আমাকে ধনভাণ্ডারের খোঁজ

দিতে বলবেন না। এতে যদি হুজুর ক্রোধ বশতঃ প্রাণ সংহারও করেন, তবুও আমি প্রতিজ্ঞা থেকে সরে আসতে পারব না। আপনি যদি রাজি হন ধনভাণ্ডার দেখানোর পরিবর্তে আমি আপনাকে দুই হাজার স্বর্ণমুদ্রা উপহার স্বরূপ দিতে প্রস্তুত আছি। সুলতান উজিরের দিকে ফিরল। চার চোখে কি কথা বিনিময় হল জানি না। সুলতান আমাকে আলিঙ্গন করে ঈশ্বরের কাছে বহুভাবে আমার মঙ্গল কামনা করলেন। আমি বাড়ী ফিরে লোক মারফৎ ষাট হাজার স্বর্ণমুদ্রা একমাসের উপহার স্বরূপ সুলতানকে পাঠিয়ে দিলাম।

বোগদাদাধিপতি কাসেমের ব্যাপার-স্যাপার দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁকে প্রাসাদে ডেকে এনে তাঁর ধনভাণ্ডার দেখার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলেন। এমনও বললেন যে, তাঁর দ্বারা কাশেমের কোনই অনিষ্ঠ হবে না।

কাসেম শেষ পর্যন্ত বললেন—মহাশয়, আপনাকে আমার ধন-ভাণ্ডার দেখাতে কোনই আপত্তি নেই। তবে কিনা আমার একটি প্রতিজ্ঞা রয়েছে, তা থেকে আমি তো সরে আসতে পারিনি। যদি নিতান্তই যেতে চান তবে চোখ দুটো বেধে এক বস্ত্রে এবং নিরস্ত্র হয়ে ধনভাণ্ডারে যেতে হবে! আপনি সম্মত থাকলে চলুন।

কোন রকম দ্বিধা না করে সুলতান কাসেমের কথায় রাজি হয়ে গেলেন।

স্থির হল আবুল কাসেম রাত্রির অন্ধকারে সুলতানকে নিয়ে ধনাগারে যাবেন।

রাত্রে আহারাদির পাট চুকিয়ে দাস-দাসীরা একে একে যে-যার ঘরে শুতে চলে গেল। বিশালায়তন প্রাসাদের মত বাড়ি ক্রমে নিঝুম-নিস্তব্ধ হয়ে এল। সুলতান বিছানায় শুয়ে নির্দ্দিষ্ট সময়ের প্রতীক্ষায় আগ্রহে সময় কাটাচ্ছেন। সময় যেন বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে—এক একটি মিনিট যেন এক একটা বছর। ক্রমে রাত্রি গভীর হল। আবুল কাসেম নিঃশব্দে সুলতানের ঘরে প্রবেশ

করলেন। সুলতান বিছানায় উঠে বসলেন। আবুল কাসেম প্রায় ফিসফিসিয়ে বললেন জাঁহাপনা আমার প্রতিজ্ঞা পালনে যদি সম্মত হন, আমার সঙ্গে আসুন।

সুলতান বললেন—আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করছি, কোন অবস্থাতেই প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করব না। আবুল কাসেম তাঁর চোখ দুটো কাপড়ের টুকরো দিয়ে বেঁধে চারদিকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সুলতানকে ধনাগারের দিকে নিয়ে চললেন। পরবর্তী সময়ে সুলতান যাতে বুঝতে না পারেন তাব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

ধনাগারে উপস্থিত হয়ে সুলতানের চোখের বাঁধন খুলে দিলেন। কাসেম একটি পাথরের দরজা খুলে দিতেই সিঁড়ি নজরে পড়ল, সোজা নিচের দিকে নেমে গেছে।

সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে যেতেই আর একটা দরজা পড়ল। খুলতেই সুলতানের চক্ষুস্থির। চোখ দুটো রগড়ে ভাল করে তাকাতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল একটি সুপ্রশস্থ চৌবাচ্চা। চৌবাচ্চাটা অসংখ্য মণিমুক্তায় পূর্ণ। তার চারদিকে দ্বাদশ হেমস্তম্ভ, প্রত্যেক স্তম্ভের মাথায় অপূর্ব কারুকার্যমণ্ডিত একটা করে রক্তবর্ণ মূর্তি দাঁড়িয়ে।

বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে সুলতান আবুল কাসেমের দিকে তাকালেন। আবুল কাসেম তাঁর মানসিক অবস্থা অনুমান করে কৌতূহল নিবৃত করতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা, এই যে চৌবাচ্চাটা দেখছেন এতে কত যে স্বর্ণমুদ্রা রয়েছে তা গণনা করে সঠিক হিসাব করা মানুষের দুঃসাধ্য। আমি প্রতিদিন এর থেকে মুক্তহস্তে দান করছি, অঙ্গুলি প্রমাণও কমাতে পারি নি। আমৃত্যু এ-ভাবে দান করলেও ফুরোবে কি না সন্দেহ।

বোগদাদের সুলতান তাঁকে সমর্থন করতে গিয়ে বললেন—কথাটা ঠিকই, দিনের পর দিন দান করলেও আপনার জীবিত অবস্থায় শেষ হবে এটা বলা যায় না।

আবুল কাসেম হেসে বললেন—যদি এটা শূন্য হয়ে যায় ক্ষতি

কি? অন্য আর একটাতে হাত দেব। কথা বলতে বলতে তিনি তাকে অন্য আর একটা ঘরে নিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকে সুলতান মূর্ছা যাবার উপক্রম। চোখের পাতা বন্ধ করতে পারছেন না। ঘরটা আগেরটা থেকে উজ্জ্বলতম। ঘরের সর্বত্র ঐশ্বর্যের ছাপ, মনিমুক্তার ঝালর শোভা পাচ্ছে। এঘরেও পূর্বকথিত ঘরের মত বিশালায়তন চৌবাচ্চা মণিমুক্তা হীরা, জহরৎ, প্রবাল প্রভৃতি নানারকম দুষ্প্রাপ্য রত্নে পূর্ণ। সুলতান বিস্ময়ে হতবাক হয়ে ভাবছেন একী বাস্তব না স্বপ্ন!

বোগদাদধিপতির মনের ভাব বুঝতে পেরে আবুল কাসেম তাঁর হাত ধরে একটা মনিমুক্তা খোচিত সিংহাসনের কাছে নিয়ে গেলেন। চোখ ধাঁধানো এই সিংহাসনের ওপর এক নারী ও এক পুরুষ অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় বসে থাকতে দেখলেন। মৃত হলেও সুলতানের চোখে যেন জীবিত বলেই মনে হল। আবুল কাসেম, সুলতানের ভ্রমশোধরাতে গিয়ে বললেন—মহাশয়, এই যে মৃত নারী ও পুরুষকে দেখছেন এরাই এই ধনভাণ্ডারের স্বত্বাধিকারী ছিলেন। পুরুষ মূর্তি হচ্ছেন বাদশা ও নারী মূর্তি হচ্ছেন রাণী। এদের সঞ্চিত অর্থই আমার হাতে এসেছে।

সুলতান বললেন—তোমার দোষ আমি দেব না। তুমি এ ধন-সম্পদ দানধ্যানে ব্যয় করতে পার। এটুকুও বলতে পারি। বৃদ্ধ সওদাগর তোমাকে যে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তা যুক্তিযুক্ত নয়। আমার একটা অনুরোধ, এই মৃত বাদশা ও রাণীর নাম জানার খুবই আগ্রহ প্রকাশ করছি।

আবুল কাসেম অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন—জাঁহাপনা আপনার অনুরোধ রক্ষা করতে আমি অক্ষম, সত্য বলতে কি, ধন-ভাণ্ডারের পূর্বাধিকারীও এঁদের নাম জানতেন না। স্বাভাবিক-ভাবেই আমার অজ্ঞাত রয়ে গেছে! কথাকটা শেষ করে আবুল কাসেম অপেক্ষাকৃত ধনসমৃদ্ধ অপর একটি ঘরে সুলতানকে নিয়ে গেলেন। ঘরটা রত্নরাজিতে পরিপূর্ণ। সুলতানের ইচ্ছা ছিল

ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত এই রত্নভাণ্ডার ঘুরে ঘুরে দেখেন আবুল কাসেম অক্ষমতা প্রকাশ করে বললেন—দাস-দাসীরা ঘুম থেকে ওঠার আগেই আমাদের প্রাসাদে ফিরে যেতে হবে, নইলে ধনভাণ্ডার গোপন থাকবে না। অনন্যোপায় হয়েই আবুল কাসেম পূর্বনির্ধারিত উপায়ে সুলতানের চোখ দুটো বেঁধে ধনভাণ্ডারের বাইরে নিয়ে গেলেন।

উজির ও তাঁর কন্যার কথা

বোগদাদের সুলতান আবুল কাসেমের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মহামূল্যবান উপহার সমূহ সঙ্গে করে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। সুলতান বিদায় নেবার অব্যবহিতকাল পরেই আবুল কাসেমের এক বিপদ দেখা দিল। বসোরার উজিরকে প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আবুল কাসেম প্রতিদিন এক হাজার মুদ্রা উপহার দিতেন। উজির খুবই খল প্রকৃতি ছিলেন। কিভাবে আবুল কাসেমের যাবতীয় সম্পত্তি নিজ হস্তগত করতে পারবেন প্রতিনিয়ত এই চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। এই কার্যসিদ্ধির জন্য যে-কোন কুকর্ম করতেও তিনি পিছপাও নয়।

এই উজিরের এক অপরূপা সুন্দরী কন্যা ছিল। নাম তার—বালকেশী। আবুল কাসেমের ধনসম্পদের মোহের বশে উজির কন্যাকে একদিন ডেকে বললেন—বৎসে তোমাকে একবারটি আবুল কাসেমের বাড়ি যেতে হবে। তোমার সবচেয়ে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে যাবে কিন্তু, তার সঙ্গে যে-কোন রকম ব্যবহার করে তার ধনভাণ্ডারের সন্ধান নিয়ে আসবে।

পিতার কথায় বালকেশী স্তম্ভিত ও মনক্ষুণ্ণ হলেন। এরকম লজ্জাকর ও নিন্দনীয় কাজ করতে অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন—আপনি পিতা হয়ে এ-রকম একটা গর্হিত পথে আমাকে ঠেলে দিচ্ছেন। তাছাড়া আপনার তো অজানা নয়, শাহজাদার

সঙ্গে আমার প্রণয় সম্বন্ধে রয়েছে। কথাটা তাঁর কানে গেলে কি পরিনাম হবে একবার ভেবে দেখেছেন? আশা করি আমাকে এ রকম নিন্দনীয় কাজ করতে দ্বিতীয়বার আদেশ করবেন না।

কন্যার ঔদ্ধতে ক্রোধোন্মত্ত উজির গর্জে উঠলেন—তোমার উপদেশ নয়, কাজ চাই। আমি চাই তুমি আমার আদেশ পালন করতে আবুল কাসেমের বাড়ি রওনা হও।

বালকেশী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—পিতা, আপনার মতিচ্ছন্নতা আমাকে ভাবিয়ে তুলেছে। বিচার-বুদ্ধি লোপ না পেলে এ-রকম কথা কেউ উচ্চারণও করতে পারে না। উজির-কন্যা রাত্রির অন্ধকারে একাকী পরপুরুষের গৃহে গেলে রাজ্যজুড়ে ঢি ঢি পড়ে যাবে যে! আমার ঐকান্তিক মিনতি, আবুল কাসেম, প্রতিদিন যে একহাজার স্বর্ণ মুদ্রা উপহার স্বরূপ পাঠাচ্ছেন তাতেই সন্তুষ্ট থাকুন। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, আপনার তো কোন অভাব নেই।

—আমি তো বলেইছি, তোমার উপদেশ নয়, কাজ চাই। আমার আদেশ পালন না করলে মৃত্যুর জন্য তৈরী হও। তোমাকে টুকরো টুকরো করে রাজপথে ফেলে রাখব, শেয়াল-কুকুরে ছিঁড়ে খাবে।

পিতার কঠিন কঠোর প্রতিজ্ঞা শেষ পর্যন্ত বালকেশী লঙ্ঘন করতে পারলে না। চোখের জল ফেলতে ফেলতে উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে পিতার সঙ্গে আবুল কাসেমের মনোরঞ্জনের জন্য যাত্রা করলেন।

গভীর রাত্রে এক অষ্টাদশী রূপসীকে দেখে দ্বাররক্ষী জিজ্ঞেস করল—তুমি কে? এত রাত্রে কোথায় যাচ্ছ?

বালকেশী ভয়ে ভয়ে জবাব দিলেন—তোমার প্রভুর সঙ্গে দেখা করতে চাই। একবারটি তাঁকে খবর দাও।

বালকেশীকে অপেক্ষা করতে বলে দ্বাররক্ষী প্রভুর কাছে সংবাদ পাঠাল। কিছুক্ষণের মধ্যেই এক পরিচারক এসে বালকেশীকে অন্দর মহলে আবুল কাসেমের কাছে নিয়ে গেল। আবুল কাসেম নৈশভোজ সেরে বিশ্রাম করছিলেন। তাঁকে দেখেই আবুল কাসেম

যথোচিত অভ্যর্থনা করে বললেন—এত রাত্রে এই অধমের কাছে ছুটে এসেছ, কি ব্যাপার বল তো? কোথায় থাক, তোমার পরিচয়ই বা কি?

বালকেশী অপেক্ষাকৃত মৃদুস্বরে জবাব দিলেন—মহাশয়, আপনার খ্যাতি পৃথিবী জুড়ে। আপনার মত দানবীর পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। পরিচয় দেবার মত কিছুই আমার নেই। একজন ভাগ্যহীনা এইটুকুই বলতে পারি। আমার অনুরোধ এর বেশী জানতে চেয়ে আমাকে লজ্জা দেবেন না।

আবুল কাসেম কোনদিনই নারীর প্রতি আসক্ত ছিলেন না। কিন্তু আজ এই অষ্টাদশী রূপসী তাঁকে হঠাৎ কেমন যেন মোহমুগ্ধ করে তুললেন। মনের কোনে গভীর চাঞ্চল্য জেগে উঠল। রূপ-সৌন্দর্য মানুষের মনকে এমন দুর্বল করে দেবার ক্ষমতা রাখে তিনি আগে কখনই তা বোঝেন নি। মোহমুগ্ধ আবুল কাসেম এক সময় সম্বিৎ ফিরে পেয়ে বললেন—আজ আমার ভাগ্যসুপ্রসন্ন! তোমার আগমনে আমি ধন্য আমার পুরীও পূতপবিত্রতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠল।

কথা বলতে বলতে আবুল কাসেম নিজেই উঠে গিয়ে মণিমুক্তা-খচিত সুরাপাত্র নিয়ে এসে যুবতীকে সুরাপানে আপ্যায়িত করলেন। নিজের পাত্রটি এক নিঃশ্বাসে শূন্য করে আবেগজড়িত কণ্ঠে আবুল কাসেম উচ্চারণ করলেন—সুন্দরি, তোমার রূপলাবণ্য, সদ্যফোটা পদ্মের মত সুন্দর মুখচ্ছবি আমার গভীরে এক অনস্বাদিত আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিচ্ছে। তোমার চরণকমলে অধমের এই নশ্বর দেহ সমর্পণ করলাম। কথা কটা কোন রকমে শেষ করে ধৈর্যহারা আবুল কাসেম বালকেশীকে নিয়ে শয্যায় গমন করলেন।

বালকেশীর দুচোখ বেয়ে জলে ধারা নেমে এল। তিনি বিছানায় শুয়েই ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলেন।

আবুল কাসেম বিস্ময় প্রকাশ করে অপরাধীর সুরে বললেন—

সুন্দরি তোমার চোখে জল, তুমি কাঁদছো ? তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করার সামান্যতম ইচ্ছাও আমার নেই। তোমার প্রতি কোন অবিচার—

বালকেশী দুহাতে মুখ থেকে কান্নাপ্লুত কণ্ঠে কেটে কেটে উচ্চারণ করলেন—মহাশয়, অপরাধ আপনার নয়, অপরাধ আমার অদৃষ্টের। অদৃষ্ট বিরূপ না হলে কোন নারী অন্ধকারে এমন করে ব্যাভিচারিণীর মত কোন পুরুষের কাছে আসে—কথা কটা বলতে বলতে বালকেশী কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বালকেশীর কথাটা কানে যেতেই আবুল কাসেমের মন হঠাৎ কেমন বিষিয়ে উঠল। ব্যাথাহত হয়ে তিনি প্রশ্ন করলেন—সুন্দরি, তোমার মুখে একী কথা শুনছি, যদি তাই হয় তবে রাত্রির অন্ধকারে আমার কাছে আসার কারণ কি ?

কান্নাপ্লুত কণ্ঠেই বালকেশী কোন রকমে জবাব দিলেন—মহাশয়, আমার পিতার নির্দেশেই এ-কাজ করতে বাধ্য হয়েছি ! আপনার গুপ্তধন ভাণ্ডারের খবর নিয়ে যেতেই হবে, এই আমার পিতার আদেশ। আমি যদি ব্যর্থ হয়ে বাড়ি ফিরি পিতা আমার শিরশ্ছেদ করবেন। এখানে এসে আমার বিপদ দেখছি আরও কঠিন রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। প্রাণের চেয়েও নারীর কাছে যার মূল্য শতগুণ বেশী, সেই সতীত্ব খোয়াতে হচ্ছে আমাকে ! বহুদিন আগে থেকেই আলি নামে এক যুবকের সঙ্গে আমার বিয়ের কথা পাকা হয়ে রয়েছে। আমি মনে-প্রাণে তাকেই স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছি। আপনার সঙ্গে সহবাস তো দূরের কথা, প্রেমালাপ করলেও আমার মন কলঙ্কিত হবে বলেই আমার বিশ্বাস। সেই আশঙ্কাতেই আমার চোখে জলের ধারা নেমে আসছে।

মর্মাহত আবুল কাসেম নিজেকে সংযত করে বললেন—সুন্দরি, যদিও তোমার রূপ-যৌবন আমার মনে ভাবান্তর ঘটিয়েছে, তবুও যখন তুমি আমার কাছে নির্দ্ধিধায় সব কিছু ব্যক্ত করলে, কথা দিচ্ছি, আমার দ্বারা তোমার কোনই অবমাননা হবে না। তুমি নিঃসংশয়ে তোমার প্রিয়তমের কাছে যেতে পার।

কিন্তু আমার পিতার সেই কঠোর নির্দেশ……

আবুল কাসেম মুচকি হেসে বললেন, তোমার এ-আশাও পূরণ করছি। চল আমার ধনভাণ্ডার দেখিয়ে আনছি। এই কথা বলে কালো কাপড় দিয়ে বালকেশীর চোখ দুটো খুব ভাল করে বেঁধে গুপ্তধন ভাণ্ডারে নিয়ে গেলেন। আবুল কাসেমের ধনভাণ্ডারে চোখ ধাঁধানো মহামূল্যবান মণিমুক্তো হীরা এবং জহরআদি স্বচক্ষে দেখে বালকেশী তো মূর্ছা যাবার উপক্রম। এত সম্পদ কারো ভাণ্ডারে থাকতে পারে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। সকাল হয়ে আসছে অনুমান করে আবুল কাসেম বালকেশীর চোখ দুটো পুনরায় ভাল করে বেঁধে ধনভাণ্ডারের বাইরে নিয়ে এলেন।

অস্থিরচিত্ত উজির বালকেশীর প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় সারাটা রাত্রি সদর দরজায় একরকম দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন। বালকেশীকে ফিরতে দেখে ব্যস্ত হয়ে ছুটে গিয়ে হাত ধরে সোজা অন্দরমহলে নিয়ে গেলেন। পিতার ব্যস্ততা ও অত্যুগ্রতা লক্ষ্য করে বালকেশী বললেন—পিতা, আবুল কাসেমের ধনভাণ্ডার আমি দেখে এসেছি। পৃথিবীর যাবতীয় ধনসম্পদ একত্রে পুঞ্জীভূত করলেও বুঝি তার ধনভাণ্ডারের সমান হবে না। তিনি আমৃত্যু অকাতরে দান করলেও এই কুবেরের ভাণ্ডার শূন্য হবে না।

উজির আগ্রহান্বিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তাই নাকি মা, হ্যাঁ, তারপর তারপর?

—ভদ্রলোক অগাধ ধনসম্পদের মালিক বটে। কিন্তু তার ধন সম্পদের চেয়ে চরিত্রই শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী।

বালকেশীর শেষ উক্তিটা উজিরের কানে গেছে বলে মনে হল না। আবুল কাসেমের অপরিমিত ধন-সম্পদের চিন্তা তাঁর দেহ-মনে গভীর রেখাপাত করল। অর্থগৃধ্নু উজিরের লোভাতুর মনের বহিঃ-প্রকাশ লক্ষিত হল চোখের বাদামী রং-এর তারা দুটোর মধ্য দিয়ে। অদ্ভুত একটা চাঞ্চল্য তার দেহ-মনে ভর করল, জেগে উঠল অন্তহীন উন্মাদনা।

উজিরের কারামুক্তি

বোগদাদের সুলতান হারুণ-অর-রসিদ আবুল কাসেমের প্রদত্ত উপহারসহ এতদিন প্রতিটি মুহূর্তে অনুতাপের জ্বালায় দগ্ধে মরছিলেন। তাঁর এই অনুতাপের একমাত্র কারণ উজির। নিরপরাধী লোকটাকে কারারুদ্ধ করেছেন। ব্যস্ত হয়ে তিনি কারাগারে ছুটে গিয়ে উজিরকে কারামুক্ত করে তাঁর হাত দুটো ধরে বিনম্র স্বরে উচ্চারণ করলেন—উজির, ভুল বুঝে তোমাকে কারারুদ্ধ করেছি। আবুল কাসেমের ধন-ভাণ্ডারে গিয়ে বুঝলাম তোমার কথাই সত্য। তাঁর সান্নিধ্যে দুদিন কাটিয়ে এ-সত্যই উপলব্ধি করলাম লোকটা শুধুমাত্র অপরিমিত ধন-সমুদ্রের অধিকারীই নন, তার চরিত্রে হাজারো গুণের সমাবেশ ঘটেছে। আমি তোমার কাছে পরামর্শ চাচ্ছি, বল কি দিয়ে তাঁর গুণের সম্বর্ধনা জানাব? তবে একটা কথা স্মরণ রেখো, শাহনশা বাদশা হয়ে তো আমার পক্ষে তার কাছে হীনতা স্বীকার করা সম্ভব নয়! কেউ ধন-সম্পদ বা চারিত্রিক গুণাবলীতে মহীয়ান হলেও, বাদশার সঙ্গে তুলনা চলে কি?

উজির কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে মুখ খুললেন—জাঁহাপনা! বসোরারাজ আপনার করদ—সবাই বলে লোকটা নাকি খুবই অত্যাচারী ও প্রজাপীড়ক। আমি ভাবছি, যদি বসোরার রাজপদে আবুল কাসেমকে প্রতিষ্ঠিত করেন প্রজাদের মাথার ওপর থেকে অত্যাচারের বোঝা নেমে গেলে তারা হয়ত একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পারে। আর এর মধ্য দিয়েই আবুল কাসেমকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করাও হবে।

সুলতান উজিরের পরামর্শকে সৎ ও যুক্তি-যুক্ত বলে মেনে নিলেন। শুভস্য শীঘ্রম্। রাজসভায় গিয়ে এক নির্দেশনামা লিখে দূত মারফৎ বসোরারাজের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। উজিরকে বললেন—তুমিও আবুল কাসেমের কাছে চলে যাও। আমার

আদেশপত্র নিয়ে গিয়ে বসোরার রাজসিংহাসনে অভিষিক্ত করবে।

সুলতানের আদেশ পালন করতে দূত ও উজির ঘোড়া ছুটিয়ে দুদিকে রওনা হলেন।

সুলতান হারুণ-অর-রসিদের দূত বসোরারাজের হাতে নির্দেশনামা তুলে দিল। রাজা ব্যস্ত হয়ে নির্দেশনামা পাঠ করেই রীতিমত স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অস্থিরচিত্ত রাজা তাঁর মন্ত্রণাদাতা উজিরকে ডেকে পাঠালেন।

কূটবুদ্ধির নাজির বৃদ্ধ উজির বললেন—এখন আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য আবুল কাসেমের সর্বনাশ করা। যে-কোন ভাবে তাঁকে বেকায়দায় ফেলতে হবে। তবে হ্যাঁ, বলপ্রয়োগে নয়, চাতুর্যের সাহায্যেই উদ্দেশ্য সিদ্ধির চিন্তা করতে হবে।

রাজা বৃদ্ধ উজিরের কূটবুদ্ধির প্রতি যথেষ্ট আস্থাবান। তিনি আশান্বিত হয়ে বললেন—ঠিক আছে, তোমার ওপরই দায়িত্ব ছেড়ে দিচ্ছি, যা ভাল বোঝ কর।

উজির দূতকে ডেকে বললেন,—তুমি এক কাজ কর, দুদিন এখানে অপেক্ষা কর। এতটা পথ ঘোড়া ছুটিয়ে এলে, আবার যদি সঙ্গে সঙ্গে রওনা দিতে হয় খুবই কষ্ট হবে। দুটো দিন বিশ্রাম করে তারপর যেয়ো।

সুলতানের দূতকে কৌশলে দুদিন আটকে রেখে কয়েকজন সভাসদ সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধ উজির আবুল কাসেমের বাড়ি গেলেন। বসোরারাজের উজির, যথোচিত সমাদর তো করতেই হবে। আবুল কাসেম উজির ও সভাসদদের অভ্যর্থনা করে একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালেন। কিন্নরীদের তলব করে নাচ-গানের ব্যবস্থা করলেন। সুদৃশ্য পাত্রে সুরা ঢেলে দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। উজির সুযোগ বুঝে আবুল কাসেমের সুরার পাত্রে গোপনে একরকম তেজী বিষের গুঁড়ো মিশিয়ে দিলেন। আবুল কাসেম সুরার পাত্রটি ঠোঁটে ছুঁইয়েই সংজ্ঞা হারিয়ে মেঝেতে লুটিয়ে পড়লেন। কিন্নরীরা ব্যস্ত হয়ে শুশ্রূষা করতে লাগল। সব চেষ্টা

ব্যর্থ করে দিয়ে আবুল কাসেমের দেহ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। উজিরের সঙ্গীরা আসল ব্যাপারটা জানতেন না। আবুল কাসেমের আকস্মিক মৃত্যুতে তাঁরা শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। কিন্তু কূটবুদ্ধির নায়ক বৃদ্ধ উজির? তিনিও চুপ করে বসে থাকলেন না বুকফাটা আর্তনাদ জুড়ে বসলেন। কপট শোকের বহিঃপ্রকাশ একটু বেশীমাত্রায়ই দেখাতে হয়। কিছুক্ষণ পরে শোক সম্বরণ করে আবুল কাসেমের নিঃসাড় দেহ একটা সিন্দুকে রেখে তালাবন্ধ করলেন। উপস্থিত সবাইকে লক্ষ্য করে উচ্চারণ করলেন— আবুল কাসেমের উত্তরাধিকারী অভাবে তাঁর যাবতীয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রাজার অধিকারভুক্ত করা হল। এ-ব্যাপারে আপনাদের কারো কোন বক্তব্য থাকলে উত্থাপন করতে পারেন। উপস্থিত সবাই নীরবে উজিরকে সমর্থন করলেন। কূটবুদ্ধি উজির এভাবে উদ্দেশ্য সিদ্ধি করে বসোরারাজের কাঁটা দূর করলেন।

আবুল কাসেমের আকস্মিক মৃত্যুসংবাদ লোক মুখে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হয়ে গেল। রাজ্যের সর্বত্র শোকের ছায়া নেমে এল।

উজির আবুল কাসেমের সমাধির ব্যবস্থা করলেন! দেশের শোকগ্রস্ত আবাল-বৃদ্ধ বনিতা কাঁদতে কাঁদতে সমাধি ক্ষেত্রের দিকে ছুটতে লাগল।

উদ্দেশ্য—এমন একটা মহৎপ্রাণ অকালে চলে গেল যদি শেষ-বারের মত চোখে দেখে জীবন সার্থক করা যায়।

সিন্দুক থেকে আবুল কাসেমের মৃতদেহ বের করে গরম জলে ধুইয়ে পবিত্র করে সমাধিস্থ করার ব্যবস্থা করা হল। গরম জলের সংস্পর্শে এসে কিছুক্ষণের মধ্যেই আবুল কাসেমের দেহে চেতনা ফিরে এল। চোখ মেলে তাকিয়ে উজিরকে জিজ্ঞেস করলেন— আমি কোথায় আছি এখানে এত লোক কেন? কি হয়েছে?

আবুল কাসেমের দেহে চেতনা ফিরে এসেছে দেখে উজিরের পিঠে কে যেন হঠাৎ চাবুক মারল। বিস্ময় বিস্ফারিত চোখে আবুল কাসেমের দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় গর্জে উঠলেন—

তোর ধনভাণ্ডার কোথায় শীঘ্র বল ? এখানে তোর এমন কোন সুহৃদ নেই যে তোকে রক্ষা করে। ধনভাণ্ডারের খোঁজ না দিলে এক্ষুণি তোকে কেটে দু'টুকরো করে দেব। বল…বল কোথায় তোর ধনভাণ্ডার ?

আবুল কাসেম ক্ষীণ স্বরে জবাব দিলেন—পাপিষ্ঠ! এখন আমি তোর জিম্মায় রয়েছি, তোর প্রাণে যা চায় কর। ধড়ে প্রাণ থাকতে ধনাগারের সন্ধান দেব না।

ব্যাপার সুবিধার নয় অনুমান করে উজির রক্ষীদের আদেশ করলেন নচ্ছারটাকে পিঠমোড়া করে বাঁধ।

উজিরের আদেশ মুহূর্তের মধ্যে পালিত হল। উজির তীব্র ক্ষোভের সঙ্গে করাতের মত তীক্ষ্ন চাবুক দিয়ে নির্মমভাবে আবুল কাসেমকে ঘন ঘন আঘাত করতে লাগলেন। বিষ জ্বালায় জর্জরিত আবুল কাসেমের দুর্বল শরীর বেশীক্ষণ চাবুকের আঘাত সইতে পারল না, পুনরায় সংজ্ঞা হারিয়ে ঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়লেন। উজিরের নির্দেশে আবার তাঁকে কাঠের সিন্দুকে তালা বন্ধ করা হল। ভাগ্যাহত আবুল কাসেমের সংজ্ঞাহীন দেহ কবরস্থ করে সবাই চলে গেলেন।

সকাল হলে উজির রাজপ্রাসাদে গিয়ে বসোরারাজকে আবুল কাসেমের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। খবরটা শুনে তিনি আনন্দিত হলেন বটে, কিন্তু সমস্যা হচ্ছে সুলতান হারুণ-অর-রসিদের দূত অপেক্ষা করছে, তাকে কি সংবাদ দিয়ে পাঠাবেন ?

উজির ব্যাপারটাকে মোটেই আমল না দিয়ে বললেন—জাঁহাপনা এটা কোন সমস্যাই নয়। সুলতানকে বলে পাঠান, আবুল কাসেম হঠাৎ সিংহাসন লাভের সংবাদটা পেয়ে আর মাথা ঠিক রাখতে পারে নি, উল্লসিত হয়ে অধিক সুরাপান করতে গিয়ে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মারা যায়।

বসোরারাজ উজিরের পরামর্শানুযায়ী চিঠি লিখে সুলতানের দূতের হাতে দিলেন।

দূত বিদায় নিয়ে বসোরার দিকে যাত্রা করল। উজির পরদিন সন্ধ্যায় মাটি খুঁড়ে সিন্দুক দেখতে পেলে, সিন্দুক খুলতেই চক্ষু স্থির। এ যে রীতিমত অভাবনীয় ব্যাপার! সিন্দুক যে ফাঁকা! নিজের ভবিষ্যৎ বিপদের কথা চিন্তা করে ছুটতে ছুটতে বসোরা-রাজের কাছে গেলেন, দুঃসংবাদটা দিলেন।

দুঃসংবাদটা কানে যেতেই বসোরারাজ তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন, উজিরকে বললেন—দেখুন, ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাবনায় ফেলেছে। আবুল কাসেম যখন কবরে নেই, নিশ্চয়ই তাকে কেউ না কেউ পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে। সে যদি বোগদাদে গিয়ে সম্রাটের কাছে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস করে দেয় তবে আপনার সঙ্গে আমারও মৃত্যু অনিবার্য।

উজিরও ভবিষ্যৎ-বিপদের সম্ভাবনায় খুবই মুষড়ে পড়লেন। কপালে হাত দিয়ে বসে কাঁদতে লাগলেন—হায় হায়। সামান্য ভুলের জন্য নিজের পায়ে নিজেই কুড়োল মারলাম! একটু বুদ্ধি করে নচ্ছারটাকে যদি খুন করে মাটিতে পুঁতে রাখতাম, তবে আর আজ এমন করে ভাবতে হত না। উজির কান্না থামিয়ে একসময় বললেন—হুজুর বসে বসে ভাবলে বিপদের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যাবে না। চলুন আমরা দুজনে দু'দল সৈন্য নিয়ে উভয় দিকে ঘোড়া ছুটাই। আবুল কাসেম হয়ত বেশীদূর যেতে পারে নি, অবশ্যই ধরে ফেলতে পারব।

এদিকে উজির জাফর ঘোড়া ছুটিয়ে বসোরাভিমুখে আসছিলেন, পথে দূতের সঙ্গে দেখা। দূত দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল—হুজুর, কেন আর কষ্ট করে বসোরা যাচ্ছেন, আবুল কাসেম আর ইহজগতে নেই, আমি নিজের চোখে তার সমাধিক্ষেত্র দেখে এলাম। অতএব দেশে ফিরে চলুন।

জাফর বিষণ্ণ মনে প্রশ্ন করলেন—আবুল কাসেম মারা গেছেন? তুই নিজের চোখে তাঁকে সমাধিস্থ করতে দেখেছিস?

দূত জবাব দিল—না, হুজুর, লোকের মুখে শুনলাম, তবে পরে গিয়ে সমাধিক্ষেত্র দেখেছি।

জাফর দূতের সঙ্গে স্বদেশে ফিরে এলেন। সুলতান হারুণ-অর-রসিদকে আবুল কাসেমের মৃত্যু সংবাদ দিলেন। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সংবাদ শুনে সুলতান মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। পারিষদদের সেবা-যত্নে কিছুক্ষণের মধ্যে সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে সুস্থ হলেন। দূতের হাত থেকে বসোরারাজের প্রেরিত পত্রটা নিয়ে পড়লেন। কয়েক মুহূর্ত নীরবে ভেবে নিয়ে এক সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—উজির, ব্যাপারটা কিন্তু আমার কাছে স্বাভাবিক মনে হচ্ছে না। বসোরারাজ রাজ্য হারানোর আশঙ্কায় হয়ত বা তাঁকে হত্যা করে পথের কাঁটা সরিয়ে দিয়েছে। আর চারদিকে প্রচার করে দিয়েছে, সুরাপানের ফলে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। তুমি সসৈন্য বাসোরা যাত্রা কর, বসোরারাজকে বন্দী করে আমার সামনে হাজির কর।

এদিকে আবুল কাসেম চৈতন্য ফিরে পেয়ে তালাবন্ধ সিন্দুকের মধ্যে যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিলেন। এমন সময় বুঝলেন, কে যেন সিন্দুকের তালা ভাঙছে। ভাবলেন—হয়ত উজির আবার ফিরে এসেছে, প্রহার করবে। সমূহ নির্যাতনের সম্ভাবনায় তিনি কাঁদতে লাগলেন।

সিন্দুকের ডালা তুলে লোকটা বলল—হুজুর, আমি উজির বা তাঁর লোক নই। বৃথা ভয় পাবেন না। নির্যাতন নয়, আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

আবুল কাসেম দুর্বল হাত দুটো দিয়ে জলে ভেজা চোখ দুটো মুছে বিস্মিত হলেন! দেখেন একজন পুরুষ ও একজন যুবতী তাঁর দিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। যুবতীকে চিনতে দেরী হল না। যাকে তিনি সেদিন ধনাগার দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আজ তাঁর দুঃসময়ে উদ্ধার করতে এসেছে।

বালকেশী করযোড়ে নিবেদন করলেন—মহাত্মা, আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি। ইনি আমার ভাবী স্বামী যুবরাজ আলি।

যুবরাজ আলি যথোচিত সম্মানের সঙ্গে নিবেদন করলেন—মহাত্মা, প্রিয়তমা বালকেশীর মুখে আপনার এই বিপদের কথা শুনে ছুটে এসেছি। আপনাকে নির্যাতন নয়, মুক্ত করাই আমাদের উদ্দেশ্য।

বালকেশী বলল—আমার পিতা যে ধন-সম্পদের লোভে আপনার অনিষ্ট করবেন, আগেই অনুমান করেছিলাম। আপনার মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হলে মনে কেমন সন্দেহ জাগল। পিতার এক বিশ্বস্ত কিন্নরকে অর্থের দ্বারা বশীভূত করে ব্যাপারটা জানতে পারলাম। যুবরাজকে সংবাদ পাঠালাম। তিনি ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। আমরা কালবিলম্ব না করে রাত্রির অন্ধকারে গোপনে আপনাকে উদ্ধার করতে এসেছি।

আবুল কাসেম বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে যুবতীর দিকে তাকিয়ে ভাবলেন—বিধির কী আশ্চর্য সৃষ্টি, এমন নিষ্ঠুর ঘরে এ-রকম গুণশীলা দয়াবতী কন্যা জন্মেছে।

যুবরাজ আলি ব্যস্ততা প্রকাশ করে বলল—প্রভু, এভাবে নিশ্চিন্ত নীরবে বিপদ ডেকে আনা সঙ্গত নয়, যে-কোন সময় উজির লোকজন নিয়ে চলে আসতে পারেন। এমন কি ব্যাপারটা তাঁর কানে গেলেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। চলুন, আপনাকে নিরাপদ আশ্রয়ে লুকিয়ে রেখে আসি।—কথা বলতে বলতে তাড়াতাড়ি আবুল কাসেমকে ছদ্মবেশ পরিয়ে নিজের বাড়ি নিয়ে গেলেন। বালকেশী একা চুপিচুপি বাড়ি গেল।

এদিকে বসোরারাজ এবং উজির আবুল কাসেমের সন্ধানে রাজ্য তোলপাড় করতে লাগলেন। সাধ্যাতীত চেষ্টা-চরিত্র করেও কোন সন্ধান না পেয়ে হতাশ মনে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। তবুও আশা ছেড়ে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকলেন না। চারদিকে সৈন্য মোতায়েন করলেন আবুল কাশেমকে দেখলেই বন্দী করে তাঁর সামনে হাজির করার জন্য।

যুবরাজ আলি নিজের ঘরে আবুল কাসেমকে রাখা নিরাপদ

মনে করলেন না। একটা তেজী ঘোড়া ও বহুমূল্য রত্ন সঙ্গে দিয়ে রাত্রির অন্ধকারে তাঁকে দূরদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করলেন।

আবুল কাসেম মুহূর্ত মাত্র সময় নষ্ট না করে যুবরাজের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোগদাদের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। ভাবলেন বোগদাদ নগরের যে ফকির তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে কদিন তার বাড়ি ছিলেন। বিদায় কালে যাকে বহুবিধ ধনরত্নে পুরস্কৃত করেছিলেন, তাঁর খোঁজ করে দিন কয়েকের জন্য গা-ঢাকা দেবেন।

আবুল কাসেম বোগদাদে পৌঁছে অনেক খোঁজাখুঁজি করেও তার ইপ্সিত ফকিরের সন্ধান পেলেন না। একদিন ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হয়ে রাজপ্রাসাদের সামনের চত্তরে বিষণ্ণ মনে বসেছিলেন প্রাসাদের জানালা দিয়ে একটি বালক বাইরে তাকিয়েছিল। হঠাৎ আবুল কাসেমের দিকে চোখ পড়তেই সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে সুলতানের কাছে ছুটে গিয়ে বলল—জাঁহাপনা, আমার প্রতিপালক আবুল কাসেম এখানে এসেছেন।

সুলতান হারুণ-অর-রসিদ বালকের কথা বিশ্বাস করতে না পেরে বললেন—আবুল কাসেম, এ-পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন। তুই হয়ত ভুল দেখেছিস। বালক বহুদিন যার সান্নিধ্যে কাটিয়েছে তাকে চিনতে ভুল করার কথা নয়। সে কথায় অধিকতর দৃঢ়তা প্রকাশ করে বলল—জাঁহাপনা, এতটুকু বয়স থেকে যাঁকে দেখে এসেছি, তাকে চিনতে কিছুতেই ভুল করতে পারি না।

সুলতান ব্যাপারটাকে তবুও তেমন আমল দিলেন না। তবে বালকের ভুল ভাঙাবার জন্য একজন অনুচরকে বালকের সঙ্গে দিলেন ব্যাপারটা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হবার জন্য।

বিধির বিচিত্র লীলা! বালক যখন অনুচরের সঙ্গে প্রাসাদের দরজা দিয়ে বেরিয়ে সামনের দিকে এগোচ্ছিল আবুল কাসেমও অবাক হয়ে ভাবছেন,—কী ব্যাপার বালকটিকে আমার সেই বালকের মত মনে হচ্ছে, সে এখানে, এই রাজপ্রাসাদে এল কি করে! এমন সময় বালক দৌড়ে গিয়ে আবুল কাসেমকে জড়িয়ে ধরল।

আবুল কাসেম অবাক বিস্ময়ে বালকের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—কি ব্যাপার। তুমি রাজপ্রাসাদে এলে কি করে ?

ছোট্ট ছেলেটি উৎফুল্ল হয়ে বলল—হুজুর আপনি কিছুদিন আগে যে ফকিরকে প্রচুর ধনরত্নসহ আমাকেও উপহার দিয়েছিলেন, তিনিই ছদ্মবেশী সুলতান হারুণ-অর-রসিদ।

বালকের মুখে একথা শুনে আবুল কাসেম উৎফুল্ল চিত্তে সুলতানের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। বোগদাদেশ্বর তাঁকে কাছে পেয়েআলিঙ্গন করলেন। অভ্যর্থনা করে তাকে সিংহাসনের একপাশে বসালেন। সুলতান বললেন—আবুল কাসেম, আমার দূত বসেরা থেকে ফিরে এসে আপনরে মৃত্যু সংবাদ দিয়েছিল। এ-সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন কি ?

কাসেম সুলতানের কাছে একে একে সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে বললেন।

সুলতান চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—দেখুন এখন বুঝতে পারছি, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য আমিই দায়ী। বসোরারাজের কাছে দূত পাঠিয়েছিলাম তাকে সিংহাসনচ্যুত করে আপনাকে অভিষিক্ত করতে। যাক, ঈশ্বরকে অশেষ ধন্যবাদ, আপনি জীবন ফিরে পেয়েছেন। আমার নির্দেশ উজির সৈন্য নিয়ে বসোরা গেছে সেই দুরাত্মাকে বন্দী করে আনতে।

সুলতান আবুল কাসেমকে নিয়ে প্রমোদ উদ্যানে গেলেন। সেখানে অতিথি আবুল কাসেমের সম্বর্ধনার ব্যবস্থা করা হয়েছে। একদল রূপসী যুবতী চোখ ঝলসানো পোষাক ও অলঙ্কারে সজ্জিতা, নাচ-গানের মধ্য দিয়ে মনোরম একটা পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। আবুল কাসেম আগ্রহের সঙ্গে নাচ দেখছিলেন। এমন সময় সম্রাজ্ঞী উদ্যানে এলেন। আবুল কাসেম যথোচিত সম্মানের সঙ্গে নতজানু হয়ে সম্রাজ্ঞীকে প্রণাম করার সময় যে যুবতীরা নাচ গান করছিল, তাদের মধ্যে একজন হঠাৎ বিকট চিৎকার করে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। আবুল কাসেম সম্রাজ্ঞীকে প্রণাম সেরে ওঠার সময়

আচমকা মূর্ছিতা যুবতীর দিকে নজর পড়তেই বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মধ্যেও কেমন যেন অস্বাভাবিকতা লক্ষিত হল। আবুল কাসেম বার কয়েক হাত-পা ছোঁড়াছুঁড়ি করে এক সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। ব্যাপার দেখে সুলতান খুবই ভীত হয়ে পড়লেন। অনেক সেবা শুশ্রূষার পর আবুল কাসেম চেতনা ফিরে পেয়ে সুলতানকে বললে—জাঁহাপনা, কায়রো নগরে যে ঘটনা আপনাকে বলেছিলাম, হয়ত মনে আছে। প্রভুত সম্পদের অধিকারী হয়েও আমি দার্দেনির জন্য দিবারাত্রি পথ চেয়ে বসেছিলাম। আমার প্রেমে অধীরা দার্দেনি কায়রোরাজের আদেশে সমুদ্র গর্ভে পতিত হয়েছিল,—এই সেই দার্দেনি।

বাদশা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—ঈশ্বরের কী অপার করুণা, আপনি আপনার প্রিয়তমা দার্দেনিকে ফিরে পেলেন।

পরিচারিকাদের সেবায় দার্দেনি সংজ্ঞা ফিরে পেলে সুলতান জিজ্ঞেস করলেন—দার্দেনি, তুমি তো সমুদ্রগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলে রক্ষা পেলে কিভাবে?

দার্দেনি সুলতানের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে বললেন—সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে এক জেলের জালে আটকা পড়ি।—তীরে ওঠানোর সময় আমার শ্বাস-প্রশ্বাস খুবই ক্ষীণভাবে চলছিল। শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তাদের ঘরে নিয়ে যায়। তারা এক দাসী-বিক্রেতার কাছে আমাকে বিক্রী করে দিল। দাসী বিক্রেতা পুনরায় আমাকে এই সম্রাজ্ঞীর কাছে বিক্রী করে দেয়।

দার্দেনি তার দুঃখের কাহিনী শেষ করলে সুলতান বললেন—আবুল কাসেম আপনার উপকারের প্রত্যুপকারের এই উপযুক্ত সুযোগ। দার্দেনির দাসীত্ব মোচন করে তাকে আপনার হাতে উৎসর্গ করতে যাচ্ছিল। মঙ্গলময়, ঈশ্বরের কাছে আপনাদের ভবিষ্যৎ সুখী জীবন কামনা করছি।

সুলতান আবুল কাসেম ও দার্দেনির বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

মহাধুমধাম ও আনন্দ-ফুর্তির মধ্য দিয়ে তাদের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ের অনুষ্ঠান মিটে গেলে একদিন আবুল কাসেম সুলতানকে বললেন—মহানুভব আমার যা কিছু সম্পদ রয়েছে সবকিছু আপনার হাতে তুলে দিয়ে আমি শঙ্কামুক্ত হতে চাই। আমার বিশ্বাস, একমাত্র আপনার দ্বারাই ওগুলোর সদ্ব্যবহার হতে পারে।

বাদশাহ অসম্মতি প্রকাশ করে বললেন, তোমার ধন তুমি ভোগ কর, আমার প্রয়োজন নেই। তোমাদের দীর্ঘ ও সুখী জীবন কামনা করি।

কয়েকদিনের মধ্যেই উজির জাফর বসোরারাজের দুর্মতি উজিরকে শৃঙ্খলিত করে বোগদাদের সুলতানের কাছে নিয়ে এল। আবুল কাসেমের পলায়নে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বসোরারাজ আত্মহত্যা করে ইতি মধ্যেই ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। সুলতান বসোরাজার উজিরের প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলেন।

উজিরের মৃত্যুদন্ডের কথায় আবুল কাসেম ব্যথিত ও মর্মাহত হয়ে সুলতানের কাছে তাঁর জীবন রক্ষার কাতর মিনতি করলেন।

আবুল কাসেমের কথায় সুলতান বিস্মিত হয়ে বললেন—আপনি কী মশায়! একদিন যে লোকটা আপনাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছিল, আজ আপনি সেই নরাধমের প্রাণ ভিক্ষা চাচ্ছেন! আপনার মত দয়ালু হৃদয়বান বিরল। আপনার মহানুভবতায় আমি মুগ্ধ। পাপিষ্ঠকে আমি যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করলাম।

বসোরার উজিরকে দণ্ডাদেশ দিয়ে সুলতান আবুল কাসেমকে বললেন——মহাশয়, আমার অভিলাষ আপনি বসোরার সিংহাসনে বসে প্রজাদের হিতসাধনে ব্রতী হোন।

আবুল কাসেম সম্রাটের কথার জবাব দিতে গিয়ে বললেন—জাঁহাপনা, আপনার আদেশ শিরোধার্য। কিন্তু আমার একটি বিনীত নিবেদন রয়েছে, অনুগ্রহ করে বসোরার সিংহাসনে আমার পরিবর্তে যুবরাজ আলিকে অভিষিক্ত করুন! সে আমার জীবন রক্ষা করেছিল, তার কাছে কৃতজ্ঞতা পাশে আমি আবদ্ধ।

সুলতান আবুল কাসেমের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। যুবরাজকে বসোরার সিংহাসনে অভিষিক্ত করা হল। আবুল কাসেমের এই অসামান্য ত্যাগের কথা দেশ-বিদেশে প্রচার হল, লোকের মুখে মুখে ঘুরতে লাগল মহত্বের কথা।

আবুল কাসেম কিছুদিন সস্ত্রীক সুলতানের আতিথ্য গ্রহণের পর শুভ মুহূর্তে বসোরা গমন করলেন।

ধাত্রী গল্প শেষ করে সখীদের মন্তব্য শুনতে চাইলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ সুলতান হারুণ-অর-রসিদকে এক বাক্যে মহৎ বলে মেনে নিল। আবার কেউ বা তাদের উক্তিকে নস্যাৎ করে দিয়ে বলে উঠল—সুলতান নয়, মহত্বের দাবী করতে পারেন আবুল কাসেম। এতকাল পরে দার্দেনির সঙ্গে পুনরায় দেখা হয়। ইতিমধ্যে তিনি প্রভুত সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন। এত পরিবর্তনেও প্রেয়সীর প্রতি প্রেম অক্ষুণ্ণই ছিল, তাকে বুকে টেনে নিলেন। তার পরেও যদি বলতে হয়, বসোরার যুবরাজ তাঁর জীবন রক্ষা করেছিলেন, প্রতিদানে বসোরার সিংহাসনে তাকে বসিয়ে যথেষ্ট ত্যাগ ও মহত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

বৃদ্ধা ধাত্রী সখীদের কথা শুনে বললেন—আবুল কাসেম মহৎ সন্দেহ নেই। প্রেমিক হিসাবে তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখেন এটাও অনস্বীকার্য, সত্য। তার মনে সিংহাসনের প্রতিও কোন লোভ ছিল না। এমন অনেক নির্লোভ ব্যক্তির কথা আমি জানি, পৃথিবীর পার্থির-অপার্থিব কোন কিছুর ওপরই তাদের বিন্দুমাত্র লোভ-লালসা-নেই। এ-রকমই একজন নির্লোভ মহৎ ব্যক্তির কথা বলছি শোন।

———

রাজবমশাহ ও চিরস্থানী সংবাদ

প্রাচীন কালে চীন দেশে এক রাজা রাজত্ব করতেন। রাজার নাম ছিল রাজবমশাহ্। তাঁর মত ধর্মানুরাগী, সৎ ও ন্যায়পরায়ণ রাজা সচরাচর দেখা যায় না। হরিণ শিকার ছিল তাঁর সখ। একদিন তিনি সভাপারিষদ ও সসৈন্যে হরিণের খোঁজ করতে করতে গভীর বনে প্রবেশ করলেন। বনের এক গভীর অংশে এক হরিণী দেখে পিছু নিলেন। হরিণীটি শুধুমাত্র রাজারই নয়, সহচরদের মনেও গভীর বিস্ময়ের উদ্রেক করল। তার গায়ের রং মিশমিশে কালো, মাঝে মধ্যে গাঢ় নীল ছোপ, পিঠের দিকটা চোখ ধাঁধানো সোনালী রং। বিচিত্র রং-এর এই হরিণীটির চার পায়ে ছিল রুপোর নূপুর। রাজা বিস্ময় উদ্রেককারী হরিণীটিকে ধরার জন্য প্রাণপণে ছুটোছুটি করতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে রাজাকে অবাক করে দিয়ে হরিণীটি চোখের পলকে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা কিন্তু আশা ছাড়লেন না। প্রতিটি ঝোপঝাড় তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলেন। অনেক খোঁজাখুঁজির পর হঠাৎ দেখতে পেলেন এক শীর্ণকায়া স্রোতস্বিনীর পাড়ে হরিণীটি শুয়ে রয়েছে। রাজা পা টিপে টিপে নিঃশব্দে এগোতে লাগলেন। সুচতুরা হরিণীটি রাজার পায়ের শব্দ শুনেই হঠাৎ লাফিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। নদীতে লাফিয়ে পড়ে চোখের আড়ালে চলে গেল।

রাজবমশাহ আশা ছাড়লেন না। ঘোড়া থেকে নেমে একটি সুপ্রশস্ত পাথরের ওপর বসে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলেন। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত্রি হল, রাত্রি পেরিয়ে হল সকাল। হতাশ মনে রাজা ভাবলেন—এ তো সামান্যা হরিণী নয়। নির্ঘাৎ কোন মায়াবিনী। হরিণীর বেশ ধরে তার সঙ্গে ছলনায় মেতেছে। রাজা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, এর শেষ কোথায় দেখতেই হবে।

রাজার দীর্ঘ অনুপস্থিতি পারিষদ ও সৈন্যদের ভাবিয়ে তুলল। তারা খুঁজতে খুঁজতে নদীর পাড়ে এসে দেখে রাজা নির্নিমেষ চোখে নদীর দিকে তাকিয়ে আছেন। রাজা উজিরকে ডেকে হরিণীর বৃত্তান্ত বললেন। শেষ পর্যন্ত তাঁর সঙ্গদান ও প্রয়োজনে পরামর্শ গ্রহণের উদ্দেশ্যে উজিরকে রেখে পারিষদ ও সৈন্যদের রাজধানীতে পাঠিয়ে দিলেন। হরিণী সম্পর্কে কৌতূহলী রাজা বৃদ্ধ উজিরকে নিয়ে নদীর ধারেই বসে থাকলেন।

ক্রমে দিনের আলো নিভে গিয়ে সন্ধ্যার অন্ধকার নেমে এলো। রাত্রি গভীর হতেই রাজা ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পাথরটির ওপর শুয়ে পড়লেন। উজিরকে বললেন—খুব ক্লান্ত, একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছি। হরিণীকে জল থেকে উঠতে দেখলেই ডেকে দিও। কিছুক্ষণের মধ্যে উজিরও ঘুমিয়ে পড়লেন। হঠাৎ বাঁশির মিষ্টি-মধুর স্বরে তাঁদের ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দুজনেইতো রীতিমত হতবাক! সামনে সুবিশাল ও সুরম্য অট্টালিকা। অত্যুজ্জ্বল সোনালী আলোয় সম্পূর্ণ বাড়িটা ঝলমল করছে। এক সময় অট্টালিকার ভেতর থেকে মন-পাগলকরা বীণার সুর বাতাসে ভেসে বেড়াতে লাগল! রাজা মোহগ্রস্তের মত উৎকর্ণ হয়ে সুরলহরী শুনতে লাগলেন।

উজির আতঙ্কে শিউরে উঠে বলতেন—মহারাজ, ব্যাপার বড় একটা সুবিধের মনে হচ্ছে না। নির্ঘাৎ এ মায়াবিনীর খেলা। চলুন জীবন নিয়ে সরে পড়ি।

রাজা উজিরের কথায় কর্ণপাত না করে একাই প্রাসাদের দিকে অগ্রসর হলেন। উজির অনন্যোপায় হয়ে তাঁকে অনুসরণ করলেন।

প্রাসাদের দ্বার খোলাই রয়েছে। নিঃশব্দে তাঁরা ভেতরে গিয়ে একটি ঘরের মধ্যে ঢুকলেন। উজ্জল আলোকমালায় ঘরটি সজ্জিত। বহুমূল্যবান মণিমুক্তখচিত একটি সুদৃশ্য সিংহাসন ঘরের কেন্দ্রস্থলে শোভা পাচ্ছিল। সিংহাসনে মূল্যবান আভরণে ভূষিতা এক পরমা সুন্দরী যুবতী বসে। রাজার দিকে তাকিয়ে ঠোঁট টিপে হাসছে, একদল রূপসী যুবতী তাকে ঘিরে বসে সুমধুর স্বরে গান গাইছে।

কিছুক্ষণ পরে সিংহাসনে উপবিষ্টা যুবতী গান বন্ধ করতে ইঙ্গিত করল।

রাজা বললেন—সুন্দরী, কে তুমি? কেনই বা এই গভীর অরণ্যে পুরুষ সমাগমশূন্য পুরীতে তুমি একাকী বাস করছ?

যুবতী ঠোঁটের কোণে হাসির রেখাটুকু বজায় রেখেই সুরেলা গলায় জবাব দিল—মহারাজ, আমিই সেই বিচিত্রা দর্শণা হরিণী। অনেক পুরুষই আপনার মত শিকার করতে এসে আমাকে দেখে মুগ্ধ হন। এখন আপনি আমাকে যা দেখছেন, এটাই আমার প্রকৃত রূপ। দৈববলে আমি এমন শক্তি পেয়েছি যে, আমি ইচ্ছামত যে-কোন মুহূর্তে যে-কোন রূপ ধারণ করতে পারি।

কথা বলতে বলতে যুবতী রাজার হাত ধরে অন্য আর একটি সুসজ্জিত ঘরে নিয়ে গেলেন। নানারকম সুস্বাদু আহার্য ও পানীয় দ্বারা আপ্যায়ণ করলেন। রাজার অন্য কোন দিকে বিন্দুমাত্র খেয়ালও ছিল না। অপলক চোখে যুবতীর রূপলাবণ্য দেখতে লাগলেন। উজির কিন্তু ব্যাপার-স্যাপার দেখে খুবই উদ্বিগ্ন হলেন। তিনি ভাবলেন—আজ অদৃষ্টে কি আছে কে জানে!

যুবতী মোহিনীহাসি ছড়িয়ে দিয়ে বলল—মহারাজ, আপনি আমার অতিথি, আহার্য ও পানীয় গ্রহণ করুন। আপনার পৌরুষ ও রূপ আমাকে মুগ্ধ করেছে। আমি রাজকন্যা। এই দেহমন আপনাকে উৎসর্গ করলাম।

রাজা মোহের ঘোর কাটিয়ে বললেন—সুন্দরী, তোমার রূপ আমাকেও কম মুগ্ধ করেনি। তুমি কেন মায়ামৃগের রূপধারণ করে এই গভীর বনে ঘুরে বেড়াও বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

যুবতী পাশের একটি আসন দখল করে বলল—মহারাজ, বলছি, শুনুন—চিরস্হান নামক সমুদ্রের বুকে একটি ছোট্ট দ্বীপ রয়েছে। সেখানে দৈত্যদের একাধিপত্য। আমি সেই দ্বীপের সম্রাটের কন্যা। চিরস্হানী আমার নাম। পিতার নাম মনটার। পিতার একমাত্র

চোখের মণি আমি, খুবই আদরের। মানবদের আবাসভূমি ও জীবনযাত্রা দেখতে বেরিয়েছি। হঠাৎ আপনার সঙ্গে দেখা। আপনার রূপে মুগ্ধ হয়ে আমার দেহমন সমর্পণ করে বসলাম। পরমুহূর্তেই নিজের কাজে অনুতপ্ত হলাম। দৈত্যকন্যা হয়ে মানবের রূপে মুগ্ধ হয়েছি। তাই পালাতে চেষ্টা করলাম। ইচ্ছা থাকলেও মন বাধা দিল। তাই হরিণীর রূপ ধরে আপনাকে ভোলাবার জন এগিয়ে এলাম। আপনিও মোহমুগ্ধ হয়ে ছুটতে লাগলেন। এব সময় আমি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে গা ঢাকা দিলাম। তখনি আপনি ধৈর্য ধরে দিনের পর দিন আমার প্রতীক্ষায় নদীর ধারে বসে রইলেন এবং খুবই কঠোর প্রতিজ্ঞায় দেখে খুবই মায়া হল।

যুবতী যখন রাজার সঙ্গে বাক্যালাপে রত তখন এক সহচরী দৈত্যকন্যা এসে খবর দিল—সখি, এইমাত্র খবর এসেছে, আপনা পিতার আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে। সিংহাসন শূন্য। প্রজার দুঃখিত এবং খুবই উদ্বিগ্ন। আপনার আগমনের প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে অপেক্ষা করছে। আপনি অবিলম্বে রাজধানীতে পৌঁছে সিংহাসনে বসে প্রজাদের উৎকণ্ঠা মুক্ত করুন।

চিরস্হানী রাজার হাত ধরে অশ্রুসিক্ত চোখে রাজার দিকে তাকিয়ে বলল—মহারাজ, বাধ্য হয়েই আমাকে স্বদেশে ফিরতে হচ্ছে। কিন্তু চোখের আড়াল হলেও আপনাকে মনের আড়ালে রাখতে পারব না। কথা দিচ্ছি শীঘ্রই আমরা আবার মিলিত হব। রাজাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজকন্যা চিরস্হানী ছলছল চোখে বিদায় নিল।

চিরস্হানী অন্তর্হিত হওয়া মাত্রই চোখের পলকে সুদৃশ্য প্রাসাদটি অদৃশ্য হয়ে গেল। রাজা দেখলেন, তিনি উজিরকে নিয়ে গভীর বনে দাঁড়িয়ে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই অন্ধকার কেটে গিয়ে পূব আকাশে ভোরে আলো ফুটে উঠল। রাজা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চারদিক দেখে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলে উজিরকে বললেন—উজির একি স্বপ্ন, না মায়া? আমরা হয়ত এতক্ষণ স্বপ্ন দেখছিলাম, তাই না?

উজির বললেন—স্বপ্ন নয়, এ মোহিনীর মায়া। যারা যুবতীর চারিদিকে বসে গান গাইছিল তারা মায়াবিনী। আপনাকে ছলনা করাই তাদের প্রধান উদ্দেশ্য। আমার মনে হয় এখানে আর এক মুহূর্তও থাকা সঙ্গত নয়। নিজের মঙ্গলের কথা চিন্তা করে সময় থাকতে এখান থেকে পালান।

রাজা উজিরের কথা পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারলেন না বটে তবে প্রাসাদে ফিরে গেলেন। চিরস্থানীর কথা কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলেন না। শয়নে-স্বপনে-জাগরণে চিরস্থানীর চিন্তা মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এক সময় তার মনের অবস্থা এমন অস্থির-চঞ্চল হয়ে পড়ল যে চিরস্থানীর দেখা পাবার লোভে প্রতি রাত্রে শিকারের ছলে বনের সেই জায়গায় গিয়ে ঘোরাফেরা শুরু করলেন। মাসাধিক কাল কেটে গেল, তবুও সেই রাজকন্যা চিরস্থানীর দেখা নেই।

রাজার মনে ভাবান্তর জাগল। তিনি ভাবলেন—চিরস্থানী বিহনে রাজ্য সিংহাসন সবই বৃথা। কি হবে অতুল ঐশ্বর্যের স্রোতে ডুবে থেকে? এ-রকম চিন্তা করে রাজা উজিরের ওপর রাজ্যের যাবতীয় দায়দায়িত্ব দিয়ে বিষণ্ণ মনে তিব্বত দেশের দিকে যাত্রা করলেন।

দেশ-দেশান্তরে ঘুরতে ঘুরতে রাজা একদিন তিব্বতরাজ্যের সীমান্তে হাজির হলেন। সেখান থেকে রাজধানী দু'দিনের পথ। একদিন পর্বতের পাদ-দেশে এক গাছে হেলান দিয়ে রাত্রি যাপন করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন নারীকণ্ঠের ক্রন্দনরোল। কৌতূহলী হয়ে এগিয়ে গেলেন। একটি গাছের নীচে বসে এক নারীকে অঝোরে কাঁদতে শুনলেন। অপরিচিতা রহস্যময়ী নারীর মহামূল্যবান আভরণ থেকে অত্যুজ্জ্বল আলোকচ্ছটা যেন ঠিকরে বেরোচ্ছে। রাজা কৌতূহলাপন্ন হয়ে প্রশ্ন করলেন—সুন্দরি! কে তুমি? রাত্রির অন্ধকারে এই জনমানবহীন পর্বতের পাদদেশে কেন এলে? কেনই বা এমন করে কাঁদছ, কিসের ব্যথা-বেদনায় তুমি দগ্ধে মরছ?

যুবতী চোখের জল মুছে শ্লেষ্মাজড়িত কণ্ঠে জবাব দিলেন—মহাশয়, আমি রাজকন্যা ও পরে রাজমহিষী ছিলাম। ভাগ বিড়ম্বনায় আজ আমি পথের ভিখারিণী। যদি আগ্রহী হো আমার দুঃখের কাহিনী বলি।

রাজার আগ্রহে যুবতী বললেন—মহাশয়, আপনার হয়ত মৈনা নামক প্রবল প্রতাপশালী জাতির কথা অবশ্যই জানা আছে। আমা পিতা ছিলেন তাদের রাজা। আমি ছিলাম তাঁর একমাত্র আদরে কন্যা। ভাগ্যের কুটিল চক্রান্তে পিতাকে অকালে ইহলোক ত্যা করতে হয়। আমার বয়স তখন মাত্র সাত বছর। প্রজারা আমাে সিংহাসনে অভিষিক্ত করল। বিশ্বস্ত মন্ত্রীর উপর রাজ্যশাসনে যাবতীয় ভার অর্পিত ছিল। স্বার্থের চক্রান্তে অচিরেই আমাে বিপদের মুখে পড়তে হল। মোয়াফেক নামে পিতার এক সহোদ ছিলেন। সবাই জানতাম মোংগলদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে তি মারা গিয়েছিলেন। কিন্তু একদিন আমার সুখের রাজত্বে ধূ কেতুর মত তাঁর আবির্ভাব ঘটল। একসময় রাজ্যের বহু আমির ওমরাহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। তাঁকে পেয়ে আমার বিপে জোট বাঁধল, উদ্দেশ্য—আমাকে সিংহাসনচ্যুত করে তাঁকে অভিষি করবে। কার্যতঃ করলেও তাই। ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে আমা পিতৃব্য সিংহাসনে বসলেন। আমি বিদ্রোহ করি, এই আশঙ্কা আমাকে হত্যার ষড়যন্ত্রও করতে লাগলেন। আমার প্রাণনাশে সম্ভাবনায় হিতাকাঙ্ক্ষী উজির গোপন আমাকে ও আমার ধাত্রী মাকে নিয়ে তিব্বতে পাড়ি দিলেন। তিনি ছিলেন চিত্রকলায় খুব পারদর্শী। সেখানে চিত্রকর বলেই পরিচয় দিলেন। এই পেশা সেখানে খ্যাতিও যথেষ্ট পেলেন।

দুঃখ-দুর্দশার মধ্য দিয়ে আমাদের বিড়ম্বিত জীবন কাটতে লাগল। অদৃষ্টের ওপর যাবতীয় দায়-দায়িত্ব চাপিয়ে কোন রকমে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একের পর এক বছর কাটতে লাগল।

উজিরের চিত্রকলায় পারদর্শিতার কথা একসময় তিব্বতরাজের

কানে উঠল। রাজা চিত্রকর উজির সাহেবকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। চিত্রবিদ্যায় উৎসাহী রাজাও সময় সুযোগমত মাঝে মধ্যে জীর্ণ কুটিরে এসে হাজির হতেন। একদিন উভয়ে যখন আলাপ আলোচনা করছিলেন তখন কার্যোপলক্ষে সে-ঘরে যাই। রাজা নির্ণিমেষ চোখে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। সসঙ্কোচে ঘর ছেড়ে চলে আসলাম।

সে দিন এ-পর্যন্তই। ক্রমে রাজার যাতায়াত বেড়ে গেল। চিত্র-কলার চেয়ে আমার প্রতি আকর্ষণেই যে তার এই মাত্রাতিরিক্ত যাতায়াত বুঝতে দেরী হল না। একদিন তিনি উজিরকে বললেন—দেখুন, রাজসভায়একজন চিত্রকরের আবশ্যক। চিত্রকলায় আপনার জ্ঞান ও পারদর্শিতায় আমি মুগ্ধ। আপনি সম্মত হলে কাজে যোগদান করতে পারেন এবং আমার প্রাসাদে আপনাদের বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে পারি। আপনি ভেবে দেখুন, সম্মত থাকলে দিন দুয়ের মধ্যে আমাকে জানাবেন।

বৃদ্ধ উজির রাজার অভিপ্রায় বুঝতে পেরে আমাকে বললেন—মা, আপনার প্রতি তিব্বতরাজ আকৃষ্ট হয়েছেন। চিত্রকর রাখার ব্যাপারটা একটা অজুহাত মাত্র। রাজপ্রাসাদে আমাদের নিয়ে তুলতে পারলে আপনাকে পাওয়া সহজ হবে অনুমান করেই তিনি এ-প্রস্তাব দিয়েছেন। বংশমর্যাদার কথা ও নারীধর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে আবেগ ও উচ্ছ্বাসের বশে যেন কোন কাজ করে বসবেন না। যারা নিজেদের হেলায় বিকিয়ে দেয় তারা ভবিষ্যতে উপায়হীনা হয়ে পড়ে। যদি তিব্বতরাজ আপনাকে বিয়ে করে রাণীর মর্যাদা দিতে সম্মত থাকেন তবে তো কথাই নেই, নইলে কোন প্রলোভনেই নিজেকে তাঁর হাতে তুলে দেবেন না।

আমি উজিরের উপদেশ পালনে সম্মত হলাম।

আমরা তিনজন রাজপ্রাসাদে গিয়ে উঠলাম। রাজা আমাদের সুখ-সুবিধার জন্য সম্ভাব্য সব রকম ব্যবস্থা করে দিলেন।

নারীধর্ম নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনায় আমি রাজাকে অত্যন্ত

সতর্কতার সঙ্গে এড়িয়ে চলতে লাগলাম। কিন্তু রাজার মধ্যে তেমন কিছু নজরে পড়ল না।

আমাকে একান্তে পেয়ে একদিন রাজা সসম্ভ্রমে ব্যক্ত করলেন—সুন্দরী, তোমাকে প্রথম দর্শনের মুহূর্তেই তোমার ঐ রাঙা চরণে নিজেকে উৎসর্গ করেছি। গোপনে তোমাকে ভোগ করার কুমতলব আমার নেই। তোমাকে পত্নীর সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করে যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়াই আমার বাসনা, অবশ্য তুমি সম্মত হলে। সর্বপ্রথমে তোমার পরিচয় দিয়ে আমার কৌতূহল দূর কর।

রাজার সৌজন্য ও মহত্বে আমি মুগ্ধ হয়ে তাঁর কাছে আমার দুর্ভাগ্যের কাহিনী ব্যক্ত করলাম।

আমার জীবন-কাহিনী তিব্বতরাজের মনে রেখাপাত করল। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়ে বললেন—সুন্দরি! আমার ওপর আস্থা রাখতে পার। তোমার শত্রুনাশ করে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। দুষ্টমতি মোয়াফেক কৃতকর্মের জন্য সমুচিত শিক্ষা পাবে। রাজার সহৃদয়তা ও আন্তরিক প্রেমে মুগ্ধ হয়ে তাকে পতিরূপে গ্রহণ করতে সম্মত হয়ে গেলাম। শুভ মুহূর্তে শাস্ত্র-সম্মত উপায়ে আমাদের বিয়ে হল।

রাজা প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী মৈনাক রাজ্যে দূত পাঠালেন। দূত মৈনাকরাজের সঙ্গে দেখা করে তিব্বতরাজের বক্তব্য পেশ করতে গিয়ে বলল—আপনি যদি রাজ্যের ও আপনার নিজের মঙ্গল চান, এই মুহূর্তে রাজ্য ছেড়ে চলে যান। অন্যথায় যুদ্ধ অনিবার্য। মোয়াফেক তিব্বতরাজের শক্তি সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিলেন না, তবুও তাঁর আদেশ অগ্রাহ্য করে দূতকে ফেরৎ পাঠালেন।

দূত তিব্বতে ফিরে গিয়ে মৈনাকরাজের ঔদ্ধতের কথা বলতেই রাজা সেনাপতিকে ডেকে মৈনাক অভিযানের প্রস্তুতি নিতে বললেন। রাজ্য জুড়ে সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

একদিন মৈনাক রাজ্যের প্রতিনিধি তিব্বতরাজের কাছে এসে

মোয়াফেকের আকস্মিক মৃত্যু-সংবাদ দিয়ে বললেন—মহারাজ, প্রজারা যুদ্ধ নয়, শান্তি চায়। আপনার বশ্যতা স্বীকার করে আমাকে আপনার দরবারে পাঠিয়েছে।

রাজা এই সংবাদ পেয়ে উল্লসিত হয়ে উজির আলি হাতেমকে প্রতিনিধি করে মৈনাক রাজ্য শাসন করতে পাঠালেন।

উজির আলি মৈনাক-যাত্রার প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। একদিন সকালে অভাবনীয় এক বিপদ দেখা দেওয়ায় আমার সব আশা চিরদিনের মত বিলীন হয়ে গেল, আমি পথের ভিখারিণী হলাম।

একদিন রাত্রে আমি ধর্মগ্রন্থ পাঠ করছিলাম। রাজা পাশের ঘরে পালঙ্কে শুয়ে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। পাঠ শেষ করে আমি শয্যায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছি, হঠাৎ ভয়ঙ্কর এক মূর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠল। ভয়ে আমার সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে আসার উপক্রম। আমি চিৎকার করে উঠলাম, রাজার ঘুম ভেঙে গেল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে আমার কাছে ছুটে এলেন। আমি বীভৎস দৃশ্য দেখার কথা বলতেই তিনি সক্রোধে গর্জে উঠলেন—কী ব্যাপার সত্য করে বল। গোপন করার চেষ্টা করবে না। তোমাকে তো আমার পাশে শুয়ে থাকতে দেখেছিলাম, এখানে কি করতে এসেছিলে?

আমি ধর্মগ্রন্থ পাঠের কথা বললাম। তাঁর পাশে সে রাত্রে তখনও শুইনি, এ-কথা বলতেই তিনি আমার হাত ধরে বলপূর্বক শোবার ঘরে নিয়ে গেলেন। পালঙ্কের দিকে নজর পড়তেই আমার মাথায় অকস্মাৎ যেন বজ্রাঘাত হল, হৃদযন্ত্রের গতিরুদ্ধ হবার উপক্রম। তাকিয়ে দেখি সত্যই এক নারী শুয়ে। আমারই মত অবয়ব, একই বেশভূষা, এমন কি মাথার চুলে হুবহু সাদৃশ্য রয়েছে। আমি স্থির থাকতে পারলাম না, হঠাৎ মাথা ঘুরে পড়ে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম।

কিছুক্ষণ পরে সংজ্ঞা ফিরে পেতেই সেই রহস্যময়ী নারী ঠিক যেন আমারই কণ্ঠস্বর অনুকরণ করে বলল—মায়াবিনী, কে তুই! কোন অভিপ্রায়ে আমার বেশ ধারণ করেছিস সত্য করে বল। তুই

ভেবেছিস আমাদের দুজনকে একই রকম দেখে আমার স্বামী তোর অভিপ্রায় বুঝতে পারবে না। আমাকে তাড়িয়ে দিয়ে তোকে শয্যায় গ্রহণ করবেন। সে দুরাশা ত্যাগ করে এক্ষুণি এখান থেকে দূর হয়ে যা। তারপর সেই মায়াবিনী রাজার দিকে ফিরে বলল —প্রাণেশ্বর, এই মায়াবিনীকে বন্দী করে অন্ধকারায় নিক্ষেপ কর। জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করে জীবিত অবস্থায় পুড়িয়ে মার।

আমি কান্নাপ্লুত কণ্ঠে বললাম—মহারাজ, আমি ভেবেছিলাম, হয়ত আমার দুর্দিনের অবসান ঘটে সত্যই সুদিন ফিরে এসেছে। সেই সৌভাগ্যেই হয়ত বা আপনার সঙ্গে মিলন হয়েছে। আজ এক মায়াবিনী এসে আমার সুখের স্বর্গ টুকরো টুকরো করে ভেঙে দিচ্ছে। আপনি কি আমাকে চিনতে ভুল করছেন? আপনি বিশ্বাস করুন, আমিই মৈনাক-রাজকন্যা, আপনার বিবাহিতা স্ত্রী।

মায়াবিনী পূর্বস্বর অনুসরণ করে গর্জে উঠল—পাপিষ্ঠা, তোর স্বভাবেই তোর পরিচয় ফুটে উঠেছে। মায়াবিনী কুহকিনীদের প্রধান লক্ষণই হচ্ছে কান্নার আশ্রয় নেওয়া ও শপথে মন ভুলানোর চেষ্টা। তুই কি ভেবেছিস তোর চোখের জলে আমার স্বামীর মন মজাবি?

রাজা ব্যাপার দেখে কেমন অপ্রতিভ হয়ে বললেন—তোমাদের দুজনের মধ্যে একজন অবশ্যই মায়ার আশ্রয় নিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনা নিয়ে আমাকে প্রতারিত করছ। কিন্তু কে যে আসল, আর কে যে সত্যই মায়াবিনী তা আমি নির্ণয় করতে অক্ষম। অতএব কাকে শাস্তি দিতে গিয়ে কাকে শাস্তি দেব তাও আমি সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না। সিদ্ধান্তে একটুকু ভুল হলে সারা জীবন আমাকে অন্তর্জ্বালায় দগ্ধে মরতে হবে।—এ-রকম চিন্তা করে রাজা প্রহরীকে ডেকে উভয়কে পৃথক পৃথক ঘরে বন্দী করে রাখতে নির্দেশ দিলেন।

রাজা পরদিন সকালে আমার ধাত্রী মা ও বৃদ্ধ উজিরকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁরা ব্যস্ত হয়ে ছুটে এলেন। বৃথা চেষ্টা, তারাও আসল-নকল নির্ণয় করে কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারলেন

না। হঠাৎ ধাত্রী মার একটা কথা মনে পড়ে গেল। জন্মক্ষণ থেকেই আমার পিঠে স্পষ্ট একটা তিল ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রেও হতাশ হতে হল। উভয়ের পিঠেই একই রকম তিলের চিহ্ন দেখতে পেলেন। এতেও তারা হাল ছাড়লেন না। আমাদের দুজনকে বিভিন্ন প্রশ্ন করলেন, একই উত্তর পেয়ে আরও বেশী রকম আশ্চর্যান্বিত হলেন। হঠাৎ বুঝলাম আমার দুর্ভাগ্য ঘনিয়ে আসছে। সবাই আমাকেই দোষী সাব্যস্ত করে বসলেন। জ্বলন্ত আগুনে পুড়িয়ে মারাই স্থির হল এবং কুহকিনীকেই প্রকৃত রাণী বলে ঘোষণা করা হল।

রাজা সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করলেন—প্রাণদণ্ডের বিনিময়ে নির্বাসনের ব্যবস্থা করলেন। তিনি নিজের মতের স্বপক্ষে যুক্তি দেখালেন, বলা যায় না ভবিষ্যতে এ-ই হয়ত নির্দোষী প্রমাণিত হতে পারে। রাজার আদেশে দাসীরা আমার মূল্যবান পোষাক খুলে ছেঁড়া একটি কাপড়ের টুকরো পরিয়ে রাজ্যের বাইরে দিয়ে গেল। পথচারীরা দয়া করে সামান্য খাবার দিয়ে যায় বলে আজও প্রাণে বেঁচে আছি। তাই বলছিলাম, রাজকন্যা ও রাজমহিষী হয়েও আমি আজ পথের ভিখারিণী।

চীনারাজ তাঁর কাহিনী শুনে বললেন—মহাশয়া, শোক সম্বরণ করুন। আমি এই মুহূর্তে শুধু এইটুকুই আশ্বাস দিতে পারি, আপনার দুঃখের দিন পার হয়েছে! আর এ-ও আশা রাখছি শীঘ্রই সুখের মুখ দেখতে পাবেন। সুখ ও দুঃখ—দুইয়ের পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়েই মানুষের জীবন নিয়ন্ত্রিত হয়। কার্বাসা উজিরের জীবনেও আপনার মত দুর্দিন দেখা দিয়েছিল। তার দুঃখময় দিনগুলির কথা বলছি শুনুন—

প্রাচীন কালে হারকেনিয়া নামে এক নগর ছিল। খোদাবন্দ ছিলেন সেখানকার রাজা। তাঁর উজিরের নাম ছিল কার্বাসা। উজিরের বুদ্ধি ও বিচার-বিবেচনা ছিল খুবই তীক্ষ্ম। একদিন নদীতে স্নান করার সময়ে তার হাতের আংটিটা হঠাৎ জলে পড়ে গেল। আশ্চর্য ব্যাপার! আংটিটা কিন্তু জলে তলিয়ে গেল না,

বরং শোলার মত জলে ভাসতে লাগল। ব্যাপারটা তাকে খুবই ভাবিয়ে তুলল। তিনি বাড়ি ফিরে চাকরদের আদেশ করলেন,—এক্ষুণি আমার মূল্যবান জিনিসপত্র অন্যত্র সরিয়ে ফেল। রাজা শীঘ্রই আমাকে বন্দী করার আদেশ দেবেন। উজিরের আশঙ্কা বাস্তব রূপ নিল। জিনিসপত্র অর্ধেক স্থানান্তরিত হতে না হতেই সেনাপতি সৈন্য নিয়ে এসে উজিরকে হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে নিয়ে গেলেন। সৈন্যরা সুযোগের সদ্ব্যবহার করল। উজিরের অবশিষ্ট জিনিসপত্র লুঠ করল।

উজির ছিলেন প্রকৃতই নির্দোষ। শত্রুর কুমন্ত্রণায় রাজা তাকে অন্ধ কারায় নিক্ষেপ করেছেন। প্রহরীরা উজিরের ওপর অত্যাচার করতে লাগল।

দীর্ঘ কয়েকমাস কারাভোগের পর উজিরের আপেল খাওয়ার সখ হল। কারাধ্যক্ষ প্রতিদিন তাঁর জন্য আপেলের ব্যবস্থা করলেন। একদিন সবেমাত্র আপেলটি হাতে দিতে যাবেন, দুটো-ইঁদুর ঝগড়া করতে করতে ওটার ওপর এসে পড়ল। স্বাভাবিক-ভাবেই ওটা খাবার অনুপযুক্ত হল। ব্যাপারটা দেখে তিনি রক্ষীদের বললেন—রাজা শীঘ্রই আমার কারামুক্তির আদেশ দেবেন। কার্যতঃ হলও তাই।

রাজার আদেশে উজির মুক্তি পেলেন। রাজা নিজের কাজের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে বললেন—তোমাকে ভুল বুঝে শাস্তি দিয়েছি, আবার কাজে যোগ দাও।

উজির ম্লান হেসে বললেন—মহারাজ, দোষ আপনার নয়, আমার অদৃষ্টের। আমি আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলাম, আমার ভাগ্যের চাকা ঘুরছে।

—তুমি আগেই ইঙ্গিত পেয়েছিলে! কি ব্যাপার বল তো? সব খুলে বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর।

উজির মুচকি হেসে প্রসঙ্গ শুরু করলেন—মহারাজ একদিন নদীতে স্নান করবার সময় আঙ্গুল থেকে আংটিটা জলে পড়ে ডুবে

না গিয়ে ভাসতে লাগল। বুঝলাম—দুর্দিন ঘনিয়ে আসছে। হাতে হাতে ফলও পেলাম। কারাভোগ কালে এক সময় আমার আপেল খাওয়ার খুবই ইচ্ছা হল। কারাধ্যক্ষ ব্যবস্থা করে দিলেন। একদিন এক ঘটনা ঘটল। দুটো ইঁদুর হুটোপাটি করতে করতে হাতের আপেলটির ওপর পড়ল। ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

চীনরাজ এই গল্প শেষ করে বললেন—রাজমহিষী, তোমার দুঃখ কেটে গেছে, সুখের দিন সামনে। আমার অবস্থাও তোমারি মত, মায়াবিনীর চক্করে ঘুরছি। কিন্তু সত্যই মায়াবিনী কিনা, নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পেঁছাতে পারছি না।

রাজমহিষীর অত্যুগ্র আগ্রহে চীনারাজ নিজের পরিচয় প্রদান করলেন।

রাত্রির অন্ধকারে বনের গভীরে তাঁরা যখন বাক্যালাপে রত তখন হঠাৎ এক বিচিত্র কাণ্ড ঘটে। তাঁদের চোখের সামনে দিয়ে এক যুবা-পুরুষ প্রায় উলঙ্গ অবস্থায় ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেল। রাণী বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—মহাশয়, ঐ···ঐ আমার স্বামী যাচ্ছেন। চোখ-মুখ দেখে মনে হচ্ছে, দারুণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পালিয়ে যাচেছন। পর মুহূর্তেই তাঁরা দেখলেন অন্য কে একজন ঘোড়া ছুটিয়ে প্রথম ব্যক্তিকে অনুসরণ করছেন। হাতে কোষমুক্ত সুতীক্ষ্ম তরবারি। পোষাক-পরিচ্ছদ রক্তে ভিজে জবজবে। তাকে স্পষ্ট বোঝা গেল অগ্রগামী ব্যক্তিকে ধরবার প্রাণপণ প্রয়াস চালাচ্ছেন। রাজমহিষী চিৎকার করে ডাকলেন, তাঁদের কেউ-ই কর্ণপাত করলেন না। ঘোড়সওয়ার দুজনের একই রকম দেহাবয়ব দেখে চীনরাজ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—রাজমহিষী এ-রকম অত্যাশ্চার্য ব্যাপার তো জীবনে কোন দিন দেখি নি! ঈশ্বরের কী বিচিত্র খেয়াল। কেন এক ছাঁচে দুজনকে গড়েছেন।

রাজমহিষী দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—মহারাজ, আমার দুঃখের কাহিনী বলার সময় যা উল্লেখ করেছিলাম, এবার প্রত্যক্ষ করে বিশ্বাস করতে পারছেন তো?

এমন সময় সেখানে, ঘোড়ার পিঠে চেপে তৃতীয় ব্যক্তির

আবির্ভাব ঘটল। রাজমহিষীকে দেখে ঘোড়া থেকে নেমে অভিবাদন সেরে সামনে দাঁড়ালেন। হঠাৎ উজিরকে দেখে রাজমহিষী বিস্ময় ও আনন্দে অভীভূত হলেন।

উজির সবিস্ময়ে নিবেদন করলে—রাণীমা, আপনাকে এখানে দেখতে পাব, এ কল্পনারও অধিক। আপনাকে নির্বাসন দিয়ে মহারাজ বড়ই দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। আজ মায়াবিনীর আসল পরিচয় পেয়েছেন। তাঁকে সমুচিত শিক্ষা দিয়ে নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। এখনও প্রাসাদ-কক্ষে তার রক্তাপ্লুত নিথর দেহ পড়ে রয়েছে। আর এক পাপিষ্ঠ রাজার অবয়ব ধারণ করে তাঁর রাজ্য গ্রাস করার চেষ্টা করছিল। রাজা তার প্রতিশোধ নিতে পিছু ধাওয়া করেছেন এই মুহূর্তে রাজাকে সাহায্য করা খুবই দরকার। একাকী থাকলে নিঃসন্দেহে পরাজিত হবেন।

উজিরের কথায় রাজা রাজবমশাহ বললেন—মহাশয়, রাণী খুবই দুর্বলা, আপনি তাঁকে নিয়ে এখানে অপেক্ষা করুন, আমি রাজার সাহায্যে যাচ্ছি। শীঘ্রই তিব্বত রাজাকে বিপদ মুক্ত করে এখানে নিয়ে আসছি।

উজিরের উত্তরের অপেক্ষা না করে রাজবমশাহ ঘোড়া ছুটিয়ে অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

রাজবমশাহ বিদায় নিলে রাজমহিষী বললেন—উজির সাহেব, রাজা পারিষদদের পরামর্শে আমাকে মায়াবিনী জ্ঞানে নির্বাসিত করার পরের কাহিনী বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন।

উজির বললেন—আপনাকে নির্বাসিত করে রাজা মায়াবিনীকে ধর্মপত্নী জ্ঞানে যথোচিত আদর-যত্ন করতে লাগলেন। মায়াবিনীর মায়ায় মজে গিয়ে রাজকার্যে ভাঁটা পড়তে শুরু করল। দিনের একটা বড় সময় অন্তঃপুরেই কাটাতে লাগলেন। আজ সকালে রাজা আমাকে নিয়ে হরিণ শিকার করতে যাত্রা করলেন। সামান্য পথ গিয়েই ঘোড়া দাঁড় করালেন। আমাকে বললেন,—উজির, আমি একবারটি মহিষীর সঙ্গে দেখা করে আসছি—কথাটি আমার

দিকে ছুঁড়ে দিয়েই ঘোড়া ফিরিয়ে ফেলে, আসা পথ ধরলেন। আমিও পিছু নিলাম। সদর দরজার কাছে পোঁছেই আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। দেখি এক অর্ধউলঙ্গ যুবা পুরুষ ঘোড়া ছুটিয়ে প্রাসাদ থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি বিস্ময় প্রকাশ করে বললাম,—প্রভু, এ কী বেশ ধারণ করেছেন। অশ্বারোহী কোন জবাব দিল না। আশ্চর্য হলাম প্রভুকে চিনতে মোটেই ভুল করিনি। একই দেহাবয়ব একই চোখ-মুখ···আমাকে না চেনার ভান করে প্রভু উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘোড়া ছুটিয়ে চলে গেলেন। ব্যাপারটা কেমন অস্বাভাবিকই মনে হ'ল। এমন সময় পিছন দিক থেকে চিৎকার শুনলাম—উজির ঐ ঘোড়সোয়ারকে ধর···পিছু নাও—কথা বলতে বলতে মহারাজ রক্তমাখা তরবারি হাতে প্রাসাদ থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন। একলাফে ঘোড়ার পিঠে চেপে পলায়নরত রহস্যময় যুবকের পিছু নিলেন। আমিও তাঁকে অনুসরণ করলাম।

*   *   *   *

রাজবমশাহ আবার নিজের রাজ্যে ফিরে এলেন।

একদিন গল্পচ্ছলে উজিরকে তিব্বতরাজ ও রাজমহিষীর অত্যাশ্চর্য কাহিনীটি বললেন। রাজা গল্প শেষ করলে উজির বললেন—মহারাজ চিরস্হানীও অবশ্যই কোন মায়াবিনী হবে, তার কুহকে আপনাকে মজিয়ে উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে যাচ্ছে।

রাজবমশাহ উজিরের কথা বিশ্বাস করে মায়াবিনী চিরস্হানীকে মন থেকে মুছে ফেলে রাজকার্যে মন দিলেন।

একদিন সকালে প্রজারা রাজদরবারে উপস্হিত হল। একজন পরিচারক এসে বলল—মহারাজ প্রাসাদে নেই।

সবাই ব্যস্ত হয়ে রাজার খোঁজ করতে লাগল। উজিরও রাজার বিচ্ছেদে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন।

এদিকে চিরস্হানীর নির্দেশে দৈত্যরা রাজবমশাহকে নিয়ে চিরস্হানীর দ্বীপে হাজির হল। চিরস্হানীকে দেখেই তিনি আনন্দে

আত্মহারা হয়ে বললেন—প্রিয়ে, আমার ভাগ্য বলেই তোমাকে পুনরায় দেখতে পেলাম। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস ছিল, তুমি আমাকে বিস্মৃত হয়েছ।

চিরস্হানীর চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। তিনি চোখ মুছে বললেন—প্রিয়তম! দৈত্যকন্যাগণ একবার যাকে অন্তরের অন্তঃস্হলে আসন পেতে দেয়, জীবন-যৌবন সঁপে দেয়, জন্ম-জন্মান্তরেও তাঁকে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে না। আমি এত-দিন আপনাকে পরীক্ষা করছিলাম। আজ বুঝতে পারছি আপনি সত্যই আমাকে অন্তর থেকে ভালবাসেন।

চিরস্হানী পারিষদদের ডেকে বললেন—আমার হিতাকাঙ্ক্ষিগণ, আমার অভিষেকের মুহূর্তে আপনারা প্রতিজ্ঞা করেছিলেন আমার যে কোন আদেশ প্রতিপালন করবেন। আমি আজ চীনাধিপতিকে আমার স্বামীত্বে বরণ করছি। আজ থেকে তিনিই এই দ্বীপের সিংহাসনে বসবেন, আপনাদের রাজা হবেন। আশা করি আপনাদের কাছ থেকে রাজার সম্মান তিনি পাবেন।

পারিষদদের সাক্ষী রেখে চিরস্হানী রাজবমশাহকে রাজমুকুট প্রদান করলেন। রাজসভায় হাসি ও আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল।

বিয়ের আয়োজনও প্রায় সম্পূর্ণ। চিরস্হানী রাজবমশাহকে বললেন,—মহারাজ, আমাদের মঙ্গলের জন্য উভয়কেই বিয়ের আগেই একটি প্রতিজ্ঞা করতে হবে, প্রতিজ্ঞা ভ্রষ্ট হলে উভয়কেই দুর্ভাগ্যের কবলে পড়তে হবে।

সামান্য ইতস্ততের পর চিরস্হানী বললেন—প্রিয়তম, আমি দৈত্যকন্যা আর আপনি মানবকুলজাত। তাই স্বাভাবিকভাবেই আমাদের রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নতর। তাই বলছিলাম কি, আমি যখন যে কাজই করি না কেন, আপনি তা সমর্থন করে নিলে কোনদিনই আমাদের বিচ্ছেদের সম্ভাবনা থাকবে না।

রাজবমশাহ তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললেন—প্রিয়ে, এমন

একটা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে তুমি এমন ভাবছ। যে-কোন রকম অবাঞ্ছিত কাজ হলেও আমি আপত্তি করব না, কথা দিচ্ছি।

চিরস্হানী বললেন—প্রিয়তম, আর একটা নিবেদন, আমার যে-কোন কাজ বিরক্তিকর মনে হলেও আমাকে কোনদিন বাধা দেবেন না বা তিরস্কার করবেন না, কথা দিন।

—পরমেশ্বরের নামে শপথ নিচ্ছি, তুমি ন্যায়সঙ্গত মনে করলে, আমি সে কাজে কখনই আপত্তি করব না, কথা দিলাম।

—প্রিয়তম, আপনার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনি বিশ্বাস রাখতে পারেন, দৈত্যকন্যা কখনও অন্যায় পথে পা বাড়াবে না।

মহা ধুমধামের সঙ্গে বিয়ের কাজ মিটে গেল।

রাজবমশাহ হেসে বললেন—প্রিয়ে, তুমি নির্দ্বিধায় তোমার প্রতিজ্ঞার কথা বলতে পার। যে-কোন শর্তেই তোমাকে নিজে করে পেতে আমি প্রস্তুত।

রাজা রাজবমশাহ নতুন রাজ্যের কর্মভার গ্রহণ করে নিজের চীন রাজ্যের কথা ক্রমে ভুলে যেতে লাগলেন। দেখতে দেখতে একটা বছর কেটে গেল। শুভ মুহূর্তে চিরস্হানী এক দেবতুল্য রাজকুমার প্রসব করলেন। খবর পেয়ে রাজবমশাহ প্রসূতিগৃহে প্রবেশ করে পুত্রের রূপ-সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ করে মুগ্ধ হলেন। বার বার চুম্বন সহযোগে পুত্রকে আদর করে রাজা চিরস্হানীর কোলে ফিরিয়ে দিলে তিনি এক পৈশাচিক কাজ করে বসলেন। পুত্রকে সামনের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করলেন।

রাজা ব্যাপারটা দেখে মনে মনে খুবই বিস্ময়াপন্ন ও ক্ষুব্ধ হলেন। কিন্তু প্রাক্-বিবাহের প্রতিজ্ঞা অনুযায়ী মুখে কিছুই প্রকাশ করলেন না। তিনি বিষণ্ন মনে ভাবছেন আমার মত দুর্ভাগা পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টি নেই। ঈশ্বর প্রদত্ত প্রথম ফল মহিষীর খেয়ালে নির্মমভাবে আগুনে দগ্ধে মরল। তার অপদার্থ পিতা পুতুলের মত দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে এমন একটা নির্মম ও গর্হিত কাজ হজম করে নিলে। হায় ঈশ্বর! কেন আমি এমন এক মায়াবিনীর

মায়ায় মজে নিজের জীবনকে হাহাকারের মুখে দিলাম! চিরস্থানীর মোহিনী মায়ায় রাজবমশাহ ক্রমে শোক ভুলে গিয়ে নতুন করে আমোদ-আহ্লাদে মেতে গেলেন। আরও একটি বছর পেরিয়ে গেল। চিরস্থানী এবার পরমাসুন্দরী এক কন্যারত্ন দান করলেন। কন্যাটি প্রাসাদ আলো করে এর-ওর কোলে কোলে ঘুরে বেড়াতে লাগল। রাজ্যজুড়ে আনন্দে মেতে উঠল। কম কথা—কন্যা হয়েছে!

চিরস্থানী কন্যাটিকে তেমনি নির্মমভাবে হত্যা করল না দেখে রাজার আনন্দ যেন আর ধরে না। একদিন ঘটল এক অভাবনীয় ঘটনা। রাজবমশাহ ও চিরস্থানী এক বিকেলে প্রমোদ উদ্যানে কন্যাটিকে নিয়ে আদর করছেন। এমন সময় কোত্থেকে এক সাদা কুকুরী ছুটে এসে তাদের সামনে দাঁড়িয়ে লেজ নাড়তে লাগল। সেই মুহূর্তে চিরস্থানী এক অত্যাশ্চর্য কাণ্ড করে বসলেন। কুকুরীর সামনে নিজের কন্যাটিকে ছুঁড়ে দিলেন। মুহূর্তের মধ্যেই কুকুরীটি তাকে কামড়ে ধরে ছুটে চোখের আড়ালে চলে গেল।

রাজবমশাহ রাণীর এই পৈশাচিক কাজে খুবই ক্রুদ্ধ হলেন। তিরস্কার করতে উদ্যত হয়েও পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞার কথা স্মরণ করে নিজেকে সংযত করে নিলেন। ক্রমে চিরস্থানীর দ্বীপ তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। দেশে ফিরে যাওয়াই শেষ পর্যন্ত সাব্যস্ত করলেন। একদিন চিরস্থানীকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলেই ফেললেন—প্রিয়ে! বহুদিন আমি রাজ্য ছাড়া। একবারটি প্রজাদের দেখে আসার জন্য মনে খুবইচাঞ্চল্যবোধ করছি! তোমার অনুমতি পেলে কিছুদিনের জন্য স্বরাজ্যে যেতে পারি।

চিরস্থানী বললেন—প্রিয়তম, তোমার প্রার্থনা পূরণ করতে আমার আপত্তির কিছুই নেই। কিন্তু এ-সময়ে আপনার সেখানে না যাওয়াই সঙ্গত। কারণ বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পারলাম মোংগলরা তোমার রাজ্য আক্রমণের তোড়জোড় করছে। যাক, চিন্তার কিছু নেই, তুমি গিয়ে সৈন্য পরিচালনা করে দেশকে শত্রুমুক্ত করে

আস। প্রয়োজনবোধে আমিও গিয়ে তোমার পাশে দাঁড়াব।—চিরস্থানী কয়েকজন দৈত্যকে ডেকে রাজবমশাহকে চীনরাজ্যে পেঁছে দিতে নির্দেশ দিলেন।

চিরস্থানীর নির্দেশে দৈত্যরা রাজবমশাহকে চীনরাজ্যে দিয়ে এল। চীনরাজ্যের উজির রাজাকে বহুদিন পর কাছে পেয়ে খুবই আনন্দিত হলেন। রাজাকে তিনি বললেন—মহারাজ, এতদিন আমার ওপর যে গুরুভার অর্পিত ছিল তা আমি আপনার হাতে ফিরিয়ে দিচ্ছি। আমাকে দায়মুক্ত করুন। রাজা স্বহস্তে দায়িত্বভার গ্রহণ করে রাজকার্যে মন দিলেন।

এক সময় মোংগলরা রাজ্যের সীমানায় শিবির স্থাপন করল। রাজবমশাহও শত্রুসৈন্যের প্রস্তুতির খবর পেয়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ওয়েলি নামক এক সেনাপতির উপর যুদ্ধের যাবতীয় দায়িত্বভার অর্পিত হল।

রাজবমশাহর শিবিরে একদিন বহুদৈত্য সহ চিরস্থানীর আকস্মিক আবির্ভাব ঘটল। দৈতরা অবিশ্বাস্য কাণ্ডে মেতে গেল। রাজবমশাহর সৈন্যদের জন্য সংগৃহীত খাদ্য ও সমরাস্ত্র-গুলো নষ্টের কাজে মেতে উঠল।

দৈত্যদের এ-রকম ধ্বংসাত্মক কাজে ওয়েলি খুবই মর্মাহত হলেন। চিরস্থানী তাকে প্রবোধ দিতে গিয়ে বললেন—ওয়েলি তোমার ভয়ের কিছু নেই। তোমার প্রভুকে গিয়ে বল, আপনার মহিষী সৈন্যদের সমস্ত খাদ্য নষ্ট করে দিয়েছেন।

ওয়েলি দ্রুত ঘোড়া ছুটিয়ে রাজার কাছে গিয়ে ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন।

ক্রোধোন্মত্ত রাজা পূর্ব প্রতিজ্ঞার কথা ভুলে গিয়ে রাণীর এরকম অদ্ভুত আচরণের প্রতিবাদ করতে গিয়ে বললেন—কী ব্যাপার! তুমি বার বার এমন নাশকতামূলক কাজ করছ কেন?

পুত্রকে জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষেপ করলে, কন্যাকে কুকুরীর মুখে ছুঁড়ে দিলে, আজ আমার সৈন্যদের রসদ নষ্ট করেছ—তোমার উদ্দেশ্য কি জানতে চাই? তুমি কি চাও, আমি বিনাযুদ্ধে মোংগলদের হাতে নির্মমভাবে বন্দী হই? তুমি পাপীয়সি! তুমি ডাইনি। তোমাকে বিশ্বাস করার ফল হাতে হাতে পাচ্ছি।

চিরস্হানী শান্তস্বরেই কথা কটা ছুঁড়ে দিলেন—মহারাজ, আপনি প্রতিজ্ঞা পালন করতে পারলে আমরা চিরদিন সুখে থাকতে পারতাম। প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে আপনি সে-পথে কাঁটা দিলেন। আমাদের অদৃষ্টের দোষেই আপনার মুখ দিয়ে ক্ষোভের কথা বেরিয়েছে, নইলে এমন তো হবার নয়! আপনার কথার জবাব দিচ্ছি। যে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে আমাদের পুত্রকে নিক্ষেপ করেছিলাম, তিনি অগ্নিকুণ্ডরূপী দৈত্যদের কুলপুরোহিত। নাম তার কাকলাশ। আর যে কুকুরী কন্যাকে নিয়ে অদৃশ্য হলেন, তিনি এক স্বর্গবিদ্যা-ধরী।—কন্যাকে নাচ-গানে পারদর্শী করার উদ্দেশ্যেই তাঁর হাতে কন্যাকে তুলে দিয়েছিলাম।—কথা শেষ করে এক দৈত্যকে দিয়ে পুত্র কন্যাকে রাজার সামনে তুলে ধরে তাঁর ভুল শুধরে দিলেন। একমাত্র রাজবমশাহ ব্যতীত কোন নরই তাদের দেখতে পেলেন না।

পুত্র কন্যাকে দেখে রাজবমশাহ আনন্দে আত্মহারা হয়ে তাদের বুকে তুলে নিলেন। চিরস্হানী কর্তৃক যুদ্ধের রসদ ধ্বংসের ক্ষোভ ভুলে গেলেন। চিরস্হানী এবার বললেন—মহারাজ, এবার বলছি শুনুন, কেন আপনার সৈন্যদের রসদ ধ্বংস করেছিলাম। মোংগলরাজ আপনার সেনাপতি ওয়েলিকে প্রচুর উৎকোচ দিয়ে হাত করে নিয়েছে। সেই বিশ্বাসঘাতক যাবতীয় খাদ্যদ্রব্যে শক্তিশালী বিষ মিশিয়ে দিয়েছিল। আমি ওগুলো নষ্ট না করলে হয়ত আপনি সমূলে ধ্বংস হয়ে যেতেন। আমাকে—বিশ্বাস না হলে ওয়েলিকে ডেকে খাদ্যদ্রব্যের কিছু অংশ খেতে বলুন, হাতে হাতে আমার কথার সত্যতা প্রমাণ পেয়ে যাবেন।

রাজার আদেশে ওয়েলি ছুটে এলেন। তিনি ওয়েলিকে সামান্য খাদ্য আহার করতে বলায় তিনি হঠাৎ কেমন মিইয়ে গেলেন! আমতা আমতা করে বললেন—মহারাজ, এখন আমার ক্ষিধে নেই, সময় মত আপনার নির্দেশ অবশ্যই পালন করব।

রাজবমশাহ ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তীরবিদ্ধ বাঘের মত উঠলেন,—দুরাত্মা, আমার আদেশ লঙ্ঘন করলে তোমাকে এই মুহূর্তেই জীবন্ত পুড়িয়ে মারব।

ওয়েলি ভয়ে ভয়ে সামান্য খাদ্যদ্রব্য মুখে দিতেই বিষ জ্বালায় ছটফট করে অচিরেই মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

চিরস্থানী বললেন—প্রিয়তম, এবার অবশ্যই বুঝতে পারছ দৈত্যকন্যারা বিনা কারণে এমনতর কাজ করে না।

লজ্জিত ও অনুতপ্ত রাজবমশাহ বললেন—প্রিয়ে, আমার ভ্রম দূর হয়েছে। না বুঝে যে অন্যায় করেছি, তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী। যুদ্ধ নিকটে, সর্বাগ্রে সৈন্যদের রসদের ব্যবস্থা করা দরকার।

চিরস্থানী বললেন—প্রিয়তম বৃথা চিন্তা করে সময় নষ্ট করার মত সময় হাতে নেই। এক কাজ করুন, আজ রাত্রেই অতর্কিতে মোংগলদের শিবির আক্রমণ করুন। শত্রুসৈন্য আকস্মিক আক্রমণে ছত্রভঙ্গ হয়ে পলায়ন করবে। এই সুযোগে আপনি তাদের যাবতীয় রসদ হস্তগত করে নেবেন।

চিরস্থানীর পরামর্শানুযায়ী চীনসৈন্য ও দৈত্যসৈন্য একত্রিত হয়ে রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে মোংগলদের শিবিরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল। মোংগলসৈন্য অতর্কিত আক্রমণ সইতে না পেরে প্রাণ নিয়ে কোনরকমে পালিয়ে বাঁচল। তাদের যাবতীয় খাদ্যদ্রব্য রাজবমশাহের হস্তগত হল।

চিরস্থানী এবার বললেন—প্রিয়তম, সময় শেষ হয়েছে, তুমি এবার নিজরাজ্যে ফিরে যাও, আমাদের বিদায় নিতে হবে। আমার

পক্ষে আর তোমার সান্নিধ্যে থাকা সম্ভব নয়। এখন থেকে আমাদের বিচ্ছেদের পালা শুরু হল।

রাজবমশাহ বিচ্ছেদ-ব্যথার আতঙ্কে শিউরে উঠে বললেন প্রিয়ে, আমার কাজের জন্য অনুতপ্ত মর্মাহত। নিজগুণে ক্ষমা করে নাও। তোমাকে ছেড়ে জীবন ধারণ আমার পক্ষে অসম্ভব। কথা দিচ্ছি। ভবিষ্যতে কোনদিনই তোমার কাজের প্রতিবাদ করব না।

—প্রাণেশ্বর, আমাকে ভুল বুঝো না। তোমাকে ছেড়ে থাকতে আমারও যে কী মর্মান্তিক দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে তা ব্যাখ্যা করা সাধ্যাতীত। কিন্তু দৈত্যকুলের চিরপ্রচলিত প্রথা লঙ্ঘন করা আমার সাধ্যাতীত।—কথা শেষ করেই চিরস্থানী পুত্র-কন্যাসহ চোখের পলকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

প্রাণেশ্বরীর অন্তর্ধানে রাজবমশাহ শোকে-দুঃখে খুবই কাতর হয়ে পড়লেন। উজিরকে ডেকে বললেন—তুমি রাজ্যশাসনের দায়িত্বভার গ্রহণ কর। আমি প্রাসাদের এককোণে ইষ্টদেবতার নামগান করে জীবনের বাকী দিনগুলি কাটিয়ে দিতে চাই। রাজকার্যের কোন ঝামেলার মধ্যে আমাকে জড়াবে না।

রাজবমশাহ নিজ প্রাসাদেই নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতে লাগলেন। শোকে-দুঃখে তার দেহ একেবারে কঙ্কালসার হয়ে গেল। দশ-দশটি বছর এমনি কৃচ্ছ্রতার মধ্যে কেটে গেল। একদিন চিরস্থানীর আবির্ভাব ঘটল। তিনি ক্ষীণকায় রাজার শিয়রে দাঁড়িয়ে বললেন—প্রিয়তম, তোমার মৃত্যু আসন্ন জেনে ছুটে আসতেই হল। তুমি যদি এতকাল আমার চিন্তায় এমনি বিভোর না থাকতে তবে আমার পক্ষে তোমার কাছে আসা সম্ভব ছিলনা। আজ আমাদের বিচ্ছেদ-কাল উত্তীর্ণ হয়েছে। তুমি এবার তোমার পুত্র-কন্যাকে ফিরে পাবে। চিরস্থানীর কথা শেষ হতে না হতেই রাজপুত্র ও রাজকন্যা সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজবমশাহ আনন্দে আত্মহারা হয়ে পুত্র-কন্যাকে জড়িয়ে ধরে বুকের জ্বালা নেভালেন। চিরস্থানী জীবনের শেষের দিনগুলি পুত্র-কন্যাসহ রাজার সান্নিধ্যে সুখেই

কাটালেন। রাজবমশাহ-যুবরাজ চীনের সিংহাসনে বসে প্রজাপালনে মন দিলেন। আর রাজকন্যা? রাজকন্যা সেই দ্বীপে গিয়ে দৈত্যদের রাণী হয়ে সুখেরাজ্যশাসন করতে লাগলেন।

ধাত্রী ফরখোনাজ রাজবমশাহ ও চিরস্থানীর কাহিনী শেষ করে গল্পটি সম্বন্ধে সখীদের মনোভাব জানার জন্য বার বার এর-ওর মুখের দিকে অনুমান করলেন গল্পটি প্রত্যেকেই উপভোগ করেছে। শাহাজাদী ও সখীরা সবাই একবাক্যে বাহবা দিয়ে উঠলেন। ধাত্রী ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন,—এমন অনেক পুরুষের কথা আমি জানি যারা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করতে জীবন উৎসর্গ করতেও প্রস্তুত। আগ্রহী হলে কৌলফ ও দেলেরার কথা তোমাদের শোনাতে পারি।

কৌলফ ও দেলেরার কথা

শাহাজাদী ও তাঁর সখীরা বৃদ্ধা ধাত্রীকে কৌলফ ও দেলেরার কথা কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলে তিনি গল্প শুরু করলেন —দামাস্কা নগরে আবদুল্লা নামে এক বণিক ছিল। বাণিজ্য করে তিনি প্রভূত সম্পদের মালিক হয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি ছিলেন নিঃসন্তান। দীন-দুঃখীর প্রতি ছিল তাঁর অশেষ করুণা, দুহাতে দান, নানাস্থানে মসজিদ, সরাইখানা ও চিকিৎসালয় স্থাপনেও প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। কোন কিছুতেই কিন্তু তাঁর মন ভরল না। শেষপর্যন্ত দেশ ভ্রমণের মধ্য দিয়ে আত্মতুষ্টি লাভের আশায় তল্পিতল্পা গুছিয়ে বেরিয়ে পড়লেন। দেশ-বিদেশে ঘুরতে ঘুরতে এক হাকিমের কাছে হাজির হলেন।

তিনি হাকিমকে বললেন—পুত্র-সন্তান লাভের আশায় জীবনে বহু দানধ্যান করেছি। কিছুতেই আমার মনস্কামনা পূর্ণ হল না। আমার পর্বত প্রমাণ অর্থের কি গতি হবে, আমার একমাত্র চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হাকিম কয়েক মুহূর্ত বণিকের মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে মুখ খুললেন—মহাশয়, আমার ওপর আস্থাবান হলে শীঘ্রই পুত্রলাভ করতে পারেন।

আবদুল্লা করজোড়ে মিনতি করলেন—বৈদ্যরাজ, অনুগ্রহ করে উপায় বলে দিন। হাকিম বললেন—মহাশয়, এমন একটি পূর্ণ যৌবনা নারী ক্রয় করুন, যে দীর্ঘকায় অথচ কৃশতনু, কটিদেশ খুবই ক্ষীণ। তাছাড়া এমন মিষ্টভাষিণী ও সদা হাস্যময়ী হবেন যাহাতে আপনাদের মধ্যে সর্বদা মনের মিল বজায় থাকে। চৌদ্দ দিন এক নাগাড়ে কৃষ্ণকায় মোষের মাংস সুরাসহ আহার করতে হবে। মনে রাখবেন এ-সময়ে আপনাকে বিষয় চিন্তা থেকে দূরে থাকতে হবে। এ-ভাবে সেই নারীর সঙ্গে সহবাসে আপনি অচিরেই সুলক্ষণ যুক্ত পুত্রলাভের সৌভাগ্য অর্জন করবেন।

হাকিমের নির্দেশ অনুযায়ী আবদুল্লা বহু খোঁজাখুঁজি করে এক নারী ক্রয় করলেন। যথা সময়ে এক সুদর্শন শিশু জন্মলাভ করল। আবদুল্লা বহু আকাঙ্ক্ষিত পুত্রের নাম রাখলেন কৌলফ।

পুত্রের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আবদুল্লা তার সুশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। কৌলফ ছিলেন অনন্যসাধারণ মেধাবী ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির ধারক। শীঘ্রই তিনি তুর্কী, লাতিন, পার্শি এবং গ্রীক ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে পরিচিতদের অবাক করে দিলেন।

সর্ববিদ্যায় পারদর্শী যুবক কৌলফকে আবদুল্লা এক মুহূর্তের জন্যও চোখের আড়াল করতে পারতেন না। শেষ-বয়সের সন্তান বলেই হয়ত পিতার একেবারে চোখের মণি হয়ে পড়েছিলেন।

বৃদ্ধ বণিক আবদুল্লা মৃত্যুকালে পুত্রকে কাছে ডেকে যাবতীয়

স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির সন্ধান ও হিতোপদেশাদি দিয়ে ধীরে ধীরে চোখ বন্ধ করলেন।

পিতার মৃত্যুর পর আবদুল্লার অপরিমেয় অর্থ হাতে পেয়ে কৌলফ যেন একেবারে সাগরে পড়লেন। একে তো যৌবনের চপলতায় মন ভরপুর, তার ওপর কাঁচা পয়সা ছড়াছড়ি, কুসংসর্গ জুটতে দেরী হল না। সঙ্গ দোষে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান কৌলফের চরিত্র কলুষিত হতে দেরী হল না।

মানুষকে পাপের ফল হাতে হাতে পেতে হয়। পিতার পর্বত প্রমাণ অর্থ অচিরেই নিঃশেষ করে পথের ভিখারী হয়ে পড়লেন।

কৌলফের হাতে ভিক্ষাপাত্র ওঠার সময় হয়ে এসেছে দেখে বন্ধু বান্ধবরা একে একে সরে পড়ল। পরিচিত মহলে ঘৃণার পাত্র হয়ে তিনি দামাস্কা নগর ত্যাগ করে কারাকোরাম নগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন, সরাইখানায় আশ্রয় নিলেন। সামান্য কিছু অর্থ যা অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে কোনরকমে পেটের জ্বালা নেভাতে লাগলেন। পরদিন পথে পথে ঘুরে রাত্রে সরাইখানায় ফিরে আসতেন!

পথে ঘুরতে ঘুরতে একদিন শুনলেন দুজন করদ রাজা বিদ্রোহী হয়েছেন। তাই কারাকোরামের মহারাজ কাবুল খাঁ সৈন্য সংগ্রহ করছেন বিদ্রোহীদের দমন করার জন্য।

খবর পেয়ে তিনি মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সুদর্শন বলিষ্ঠ ও যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী কৌলফকে সেনাপতি নিযুক্ত করে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠালেন। কৌলফের অসাধারণ যুদ্ধকৌশলের কাছে দাঁড়াতে না পেরে করদ রাজারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হলেন। মহারাজ বীরত্বে মুগ্ধ হলেন। যুবরাজ মির্জান তাঁকে বন্ধুরূপে বরণ করে নিলেন।

কিছুদিন পর সম্রাট কাবেল খাঁর মৃত্যু হয়। যুবরাজ মির্জান সিংহাসনে বসে কৌলফকে প্রধান উজিরের পদে নিযুক্ত করেন।

একদিন কৌলফ রাজপথ দিয়ে যাবার সময় দেখলেন ছয়টি

স্ত্রীলোক অবগুণ্ঠনে আবৃত অবস্থায় পথের ধার দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। তাদের মধ্যে এক অতিবৃদ্ধা লাঠি ভর দিয়ে আগে আগে চলেছেন। কৌলফ কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞেস করলেন—তুমি কেগো, এ-সব নারী বিক্রী করবে কি?

বৃদ্ধা কৌলফের পোষাক-পরিচ্ছদের দিকে এক পলক তাকিয়ে নিয়ে বলল—হ্যাঁ, বিক্রী করব বটে, তবে এদের কোনটি আপনার কেনায় যদি ইচ্ছে হয় সঙ্গে আসতে পারেন। যাকে আপনি প্রণয়ের উপযুক্তা বিবেচনা করবেন, উচিত মূল্য দিয়ে কিনে নিতে পারবেন। কৌলফ বৃদ্ধাকে অনুসরণ করলেন।

বৃদ্ধা কৌলফকে নিয়ে এক উপাসনা-গৃহের দ্বারে গিয়ে কৌলফকে দাঁড় করিয়ে ভেতরে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরে স্ত্রীলোকের পরিধেয় বহুমূল্য বস্ত্রাদিসহ ফিরে এসে বললেন—এখানে পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই, আপনাকে নারীবেশে অন্দর-মহলে যেতে হবে। শীঘ্র এই বস্ত্রাদি পরে তৈরী হয়ে নিন।

কৌলফ বৃদ্ধার কথায় সম্মত হয়ে পুরুষের বেশ পরিত্যাগ করে নারী-বেশ ধারণ করে বৃদ্ধার পিছন পিছন অন্দরমহলে প্রবেশ করলেন। সুন্দর পরিপাটি করে বাড়িটি সাজানো। বিস্ময়-বিষ্ফারিত চোখে সবকিছু দেখতে দেখতে কৌলফ একের পর এক ঘর অতিক্রম করে এগিয়ে চললেন। এমন সময় এক রূপসী যুবতী হাসতে হাসতে এগিয়ে এসে তাঁর হাত ধরে একটি ঘরে নিয়ে গেলেন। প্রথম দর্শনেই কৌলফ তাকে মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছেন। যুবতী তাঁকে বহুমূল্যবান এক সিংহাসনে বসাল। এবার আর এক পরমা-সুন্দরী এসে সোনার পাত্র থেকে জল ঢেলে ঢেলে অতি-যত্নে তাঁর পা দুটো ধুইয়ে দিল। কিছুক্ষণের মধ্যেই আরও অত্যাশ্চর্য ঘটনা ঘটল। কুড়িজন যুবতী পরিবেষ্ঠিতা হয়ে এক অপরূপা ঘরে ঢুকলেন। ব্যাপার স্যাপার দেখে কৌলফ সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললেন। যুবতীরা সেবাশুশ্রূষা করে তাঁকে সুস্থ করে তুললেন।

সংজ্ঞা ফিরে পেয়ে কৌলফ সসঙ্কোচে বললেন,—হঠাৎ রূপের

হাটে নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। কাজেই সংজ্ঞা হারিয়ে বসেছিলাম।

যুবতী কৌলফের হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন। কৌলফ হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে যুবতীর পায়ে পড়ে বললেন,—প্রিয়তমে তোমার রূপ আমাকে পাগল করে তুলছে। তোমাকে ছেড়ে জীবন ধারণ কল্পনাও করতে পারি না। কথা দাও, আমার জীবন-সঙ্গিনী হবে।

কৌলফের কথায় যুবতী ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—মূর্খ, তোর এত স্পর্ধা! তুই কুলকামিনীর প্রেম প্রার্থনা করছিস!

বৃদ্ধা ঘরে ঢুকে বললেন—তুমি আমাকে ভুল বুঝে অন্যায় করেছ। যদি আমি দাসী-ব্যবসায়ী-ই হতাম, তোমাকে বাড়ির ভেতরে নিয়ে আসতাম না। তুমি যার প্রেম-প্রার্থনা করলে তিনি প্রধান রাজ সচিবের কন্যা।

কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই সেই রূপসী যুবতী বেশ পরিবর্তন করে এসে বললেন—আপনাকে এবারের মত ক্ষমা করলাম। আপনার পরিচয় জানতে ইচ্ছা করি।

কৌলফ পরিচয় দিতে গিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী, আমি এখানকার প্রধান সেনাপতি। নাম কৌলফ।

যুবতী ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললে—মহাশয়! আমি বহু আগেই আপনার নাম ও সুখ্যাতির বহু প্রশংসা শুনেছি, আজ আপনাকে আমাদের বাড়িতে দেখে খুবই আনন্দিত হলাম। আপনার সান্নিধ্য আমাদের আনন্দ বর্ধন করুক।

কৌলফকে নাচ-গানের মধ্য দিয়ে সম্বর্ধনা করা হলে যুবতী মনে সাহস সঞ্চার করে এক সময় বললেন—আপনি যখন রাজার প্রধান প্রিয়জন, একটি কথা বলে আমার কৌতূহল নিবৃত্ত করুন। বলল, —রাজঅন্তঃপুরে কোন নারী রূপে-গুণে শ্রেষ্ঠা ও রাজা কাকে সর্বাধিক ভালবাসেন।

কৌলফ হেসে জবাব দিলেন—গোলেন্দা নামে এক অনন্যা-

সাধারণ যুবতীই শ্রেষ্ঠা। মহারাজ তাকে সর্বাধিক ভালবাসেন। এই মুহূর্তে আমার চোখে কিন্তু তুমিই সর্বাধিক সুন্দরী বলে বিবেচিত। তোমার কাছে তাঁর রূপ যৌবন ম্লান হয়ে গেছে।

বৈরক নামে এক উজিরের কন্যা রূপসৌন্দর্যের আকর এই যুবতী। নাম তাঁর দেলেরা। রাজকার্যোপলক্ষে বৈরককে কোর্জাণ্ড. দেশেই বছরের বেশীরভাগ সময় থাকতে হয়। যুবতী সখীদের নিয়ে এখানে আনন্দস্ফূর্তির মধ্য দিয়ে কালযাপন করেন। মাঝে মধ্যে পুরুষ-দেরও এনে আনন্দ বৃদ্ধি করে থাকেন। তবে নবাগত পুরুষকে কোনরকম অসদাচারণ করতে.দেখলে কঠোর শাস্তি দিতেও ইতস্ততঃত করেন না। যুবতী কৌলফের সঙ্গে প্রেমালাপে মত্ত হলেন।

কৌলফ রাত্রির শেষার্দ্ধে সবিনয়ে নিবেদন করলেন—সুন্দরী, তোমার সাহচর্যে আজ আমার জীবন ধন্য হল। রাত্রি প্রায় শেষ। আজকের মত আমাকে বিদায় দাও। অনুমতি পেলে আগামীকালও এসে আমোদ-প্রমোদ করে জীবন ধন্য করে যেতে উৎসুক।

যুবতী স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ একটি পাত্র তাঁর সামনে তুলে ধরে বললেন—কাল যদি সত্য সত্যই এখানে আসতে চাও, তবে এই স্বর্ণমুদ্রাগুলো গ্রহণ কর।

যুবতীর নির্দেশে প্রহরী কৌলফকে প্রাসাদের গোপন দরজা দিয়ে সদর রাস্তায় পেঁৗছে দিয়ে এল।

সকালে রাজসভায় উপস্থিত হলে মহারাজ মির্জান জিজ্ঞেস করলেন—কৌলফ, কাল রাত্রে তুমি কোথায় ছিলে, খোঁজ করে পাই নি যে?

রাজার আগ্রহে কৌলফ দেলেরার বৃত্তান্ত নিবেদন করলেন। কৌতূহলী রাজা আগ্রহান্বিত হয়ে বললেন—কৌলফ, তোমার কথায় মনে হচ্ছে, ওই যুবতী বিশ্বের সুন্দরীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠা। এক বারটি তার রূপ-সৌন্দর্য স্বচক্ষে দেখে জীবন সার্থক করতে চাই।

কৌলফ বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—মহারাজ, এ কি করে সম্ভব? আপনি রাজাধিরাজ হয়ে—

কৌলফের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে রাজা বললেন—তার জন্য ভেবো না, আমি ছদ্মবেশ ধারণ করে যাব। তুমি আমাকে তোমার পরিচারক বলে পরিচয় দেবে।

উপায়ান্তর না দেখে কৌলফ রাজাকে চাকরের ছদ্মবেশে সাজিয়ে রাত্রির অন্ধকারে রাজপথের পূর্ব-নির্ধারিত স্থানে পেঁছে বৃদ্ধার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন।

কৌলফকে দেখে বৃদ্ধা বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—কী ব্যাপার আজ আবার একজন সঙ্গী নিয়ে এসেছ যে ?

কৌলফ মুখে হাসির রেখা ফুটিয়ে বললেন—আমার পরিচারক। খুবই সুগায়ক বলে সঙ্গে করে নিয়ে এলাম। আপনার অনুমতি পেলে সঙ্গে নিয়ে যাই।

বৃদ্ধা কোন প্রতিবাদ না করে কৌলফ ও ছদ্মবেশী রাজাকে নারী-বেশে সজ্জিত করে গোপন দরজা দিয়ে প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। সঙ্গের দ্বিতীয় ব্যক্তির দিকে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে সেই সুন্দরী তাকিয়ে থাকলেন। কৌলফ হেসে বললেন—খুবই ভাল গান গায়, সঙ্গে নিয়ে এসেছি। তাছাড়া লোকটা আমারই পরিচারক।

দেলেরা বললেন—ভালই করেছ। এখানেই থাক। হাসাহাসি কাজকর্ম করেও সাহায্য করতে পারবে।

কৌলফ একগাল হেসে বললেন—ঠিক আছে আমার এই যুবক দাসটিকে তোমায় প্রদান করছি।

কৌলফ ও দেলেরার কথোপকথন শুনে পরিচারক বেশী রাজা বললেন—দেবী, আজ থেকে নিজেকে চিরদিনের দাস বলে মনে করছি। আমৃত্যু আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকব।

দেলেরা বললেন—আজ থেকে একে দাস বলে গ্রহণ করলেও এখানে রাখা সমীচীন হবে না। লোকনিন্দার ভয় রয়েছে। তুমি যখন আসবে, সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।

পরিচারক বেশী রাজা মহা উৎসাহে সবাইকে খাদ্য ও পানীয় বিতরণ করতে লাগলেন। যুবতী পরিচারককেও একসঙ্গে বসে

আহারের অনুমতি দিলেন। তিনজনে মহা উল্লাসের সঙ্গে পানাহার করলেন।

দেলেরা কৌলফের দিকে সুরাপূর্ণ একটি পাত্র এগিয়ে দিয়ে একগাল হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললেন—প্রিয়তম, এই সুরাটুকু পান করে রাজমহিষী গোলেন্দামের প্রতি তুমি যে মনে মনে গোপন আকর্ষণ অনুভব কর, তা পূর্ণ কর।

কৌলফ বিস্ময় প্রকাশ করে ও রীতিমত অপ্রস্তুত হয়ে বললেন—একী কথা প্রিয়তমা, তিনি রাজ-মহিষী, আমি তাঁর দাসানুদাস।

দেলেরা বিদ্রূপাত্মক হাসি হেসে বললেন—কি ব্যাপার, আজ সাধুতার পরিচয় দিচ্ছ যে বড়? কাল তো সে-রকমই বললে। তুমি কি আমার সঙ্গে যেমন প্রেমালাপ করেছ, তাঁর সঙ্গে সে-রকম করনি?

—কই এমন কথা তো ভুলেও উচ্চারণ করিনি।

—ভুলে গেলে চলবে কেন? কাল রাত্রে এ-রকমই বলেছিলে। এখানে তো আর কেউ নেই, কেউ রাজার কানে গিয়ে এ-কথা তুলবে না। তারপর ভৃত্যকে বললেন—তোমার প্রভুকে জিজ্ঞেস কর, কেন কথাটা গোপন করছে?

ভৃত্যবেশী রাজা বললেন—মহাশয়, সত্য গোপনের কারণ কি? রাজ-মহিষীর প্রেমাসক্ত কি করে হয়েছেন? কিভাবেই বা রাজার কাছে গোপন রেখেছেন বিস্তারিত বলুন।

কৌলফ রাজার কথায় একেবারে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। দেলেরা এক সময় বীণা যন্ত্র নিয়ে গান ধরলেন। তাঁর সুরেলা কণ্ঠের গান শুনে রাজা এমনই মোহিত হয়ে গেলেন যে, পার্থিব জগতের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে সোল্লাসে বলে উঠলেন—প্রিয়তমে, আমার সভায় যে সব কৃতি গায়ক রয়েছেন, তাদের মধ্যে গায়ক মোজিন সর্বশ্রেষ্ঠ, আজ দেখছি তোমার গলার কাছে তিনি শিশুমাত্র!

ব্যাপারটা দেলেরার বুঝতে দেরী হল না। দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে সখীদের কাছে কপাল চাপড়ে বললেন—সখিগণ,

সর্বনাশ হয়েছে! কৌলফ রাজাকে সাজিয়ে এনেছে। এখন কি করা কর্তব্য, বুদ্ধি দাও।

সখীদের পরামর্শে দেলেরা ঘরে ঢুকে ম্লান মুখে করজোড়ে রাজার সামনে দাঁড়িয়ে বললেন—মহারাজ, অধীনের অপরাধ ক্ষমা করুন।

রাজা তাঁকে অভয় দিয়ে তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে দেলেরা নিজের পরিচয় দিলেন। ভোর হওয়ার আগেই রাজা কৌলফকে নিয়ে প্রাসাদে গেলেন।

রাজা রাজ-মহিষী ও কৌলফের কথা যুবতীর মুখে যা শুনেছিলেন তাতে অবিশ্বাসী হওয়ার জন্য কৌলফকে দেশান্তরে পাঠিয়ে দিলেন। নির্বাসন-দণ্ড দিলেন।

কৌলফ রাজার ভুলের মাশুল দিতে গিয়ে সমরখন্দ নগরে চলে গেলেন। সেখানে কপর্দকশূন্য অবস্থায় এক উপাসনা-মন্দিরে আশ্রয় নিলেন। একদিন সেখানে মজাফর নামে এক সাধুর আবির্ভাব ঘটল। সাধুর আগ্রহে কৌলফ নিজের পরিচয় দিলেন। কৌলফের দুর্দশায় সাধুর দয়া হল। তাঁকে নিজের কুটিরে এনে সামান্য অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। কিছুদিন পর আবার একদিন উপাসনা-মন্দির থেকে কৌলফকে ডেকে আরও কিছু অর্থ দিলেন। এমনি করে যখন কৌলফ দুঃখের দিনগুলো কাটাচ্ছিলেন তখন দানেসনন্দ নামে এক লোকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। তিনি কৌলফকে বললেন—মজাফর সাধু কেন ডেকে ডেকে ধনরত্ন দিচ্ছেন, হয়ত তোমার জানা নেই। তাঁর পুত্র তাহেরকে বিয়ে দিয়েছিলেন। মনের মিল না হওয়ায় তাহের স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে। ক্রোধের উপশম হলে স্ত্রীকে নতুন করে পাবার জন্য খুবই ব্যাকুল হয়ে পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রের বিধান হচ্ছে, পরিত্যক্ত স্ত্রীকে কেউ বিয়ে করে পুনরায় পরিত্যাগ না করলে তাকে তাহের গ্রহণ করতে পারবে না। মজাফরের ইচ্ছা তুমি কাল সকালে তাকে বিয়ে করে পুনরায় তরিত্যাগ করে তাহেরের রাস্তা পরিষ্কার করে দাও। সামান্য একটা কাজে যদি মজাফরের উপকার হয়, তোমার আর অসুবিধার কি থাকতে পারে, তাই না? তবে হ্যাঁ, বিয়ের সময় তোমাকে

প্রতিজ্ঞা করতে হবে, ব্যাপারটা কারো কাছে প্রকাশ করবে না।

কৌলফ তাঁর প্রস্তাবে সম্মত হলেন।

বিয়ের সময় ভার্যার মুখ গলা পর্যন্ত কাপড় টেনে ঢেকে দেওয়া ছিল পাছে রূপ-সৌন্দর্যে মজে গিয়ে কৌলফ স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে অসম্মত হয়।

বাসর ঘরে কৌলফ দীর্ঘশ্বাস ফলে বললেন—সুন্দরী কী দুর্ভাগ্য এমন অমূল্য রত্ন হাতে পেয়েও কাল হারাতে হবে।

কৌলফের সদ্য বিবাহিতা স্ত্রী ঘোমটার আড়াল থেকে আঁৎকে উঠে বললেন—কে? কে তুমি। এমন পরিচিত কণ্ঠস্বর? তুমি কি সেই কৌলফ?—আমি সেই ভাগ্যবিড়ম্বিতা দেলেরা। শুনেছি আমার কথায় মহারাজ তোমাকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। পাপিষ্ঠাকে ক্ষমা কর। আমার পিতা কার্যোপলক্ষে এখানে প্রায়ই আসতেন। মজাফরের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়! তাঁর পুত্রের সঙ্গে আমার বিয়ে দেন। বিয়ের পর স্বামীর কাছ থেকে মুহূর্তের জন্যও সুখ পাইনি। চোখের জল ফেলে তোমার কথাই অষ্টক্ষণ ভাবতাম। ঈশ্বরের কৃপায় দেখা পেলাম।

কথাবার্তার মধ্য দিয়ে কখন যে ভোর হয়েছে নবদম্পতি টেরই পান নি। মজাফর দরজায় করাঘাত করতে লাগলেন। বিষণ্ণ মনে কৌলফ দরজা খুলে দিলেন। উপায় নেই, প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতেই হবে। কৌলফ উপায়ান্তর না দেখে দরজা খুলে দিলেন।

মজাফর কৌলফের হাতে পঞ্চাশটি স্বর্ণ মুদ্রা গুঁজে দিয়ে বললেন—প্রতিশ্রুতি রক্ষা কর, পত্নী ত্যাগ করে অনত্র চলে যাও।

কৌলফ মুদ্রাগুলো ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্রোধ প্রকাশ করে বললেন—এ কি অন্যায় কথা বলছেন। ন্যায়পরায়ণ রাজা আসরেফের প্রজাগণ এমন প্রবঞ্চক, আগে জানতাম না তো! আমাকে বিদেশী পেয়েই হয়ত এমন প্রবঞ্চনা করতে সাহস পাচ্ছেন। রাজার কাছে এ-সব বললে সমুচিত শাস্তি পেতে হবে জেনে রাখবেন।

মজাফর বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন—কী ব্যাপার! প্রতিশ্রুতির

কথা অস্বীকার করতে চাচ্ছ ? তুমি আরও অর্থ আশা করছ ?

—মহাশয়, অর্থের লিপ্সা আমার নেই। এক কোটি স্বর্ণ-মুদ্রা পেলেও আমি ধর্মপত্নী ত্যাগ করব না। দরকার হয় কাজীর নিকট চলুন, উপযুক্ত শাস্তি পেয়ে যাবেন।

মজাফর, তাহের এবং দাসেননন্দ কৌলফকে প্রথমে রক্তচক্ষু, পরে পরে অনেক ভাবে অনুনয় বিনয় করলেন। কিছুতেই তিনি এতটুকুও টললেন না। কাজী বিচার করে শেষ পর্যন্ত বলতে বাধ্য হলেন—ভিক্ষুক কোথাকার, যদি প্রাণের মায়া থাকে, এক্ষণি পত্নী ত্যাগ করে এখান থেকে বিদায় হ, নইলে তোকে দু'টুকরো করে দেব।

কাজীর কথাতেও কৌলফ এতটুকু নরম হলেন না। ক্রুদ্ধ কাজী অনুচরদের বেত্রাঘাতের নির্দেশ দিলেন। একশত বেত্রাঘাতেও তার মতের পরিবর্তন হল না। কাজী পরের দিন কঠিন শাস্তির ভয় দেখালেন।

দেলেরা কাজীর কথায় খুবই মুষড়ে পড়লেন। ভাবলেন, যদি কৌলফ শাস্তির ভয়ে তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে যান।

কৌলফ তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরে বললেন—কাজীর শাস্তি যত কঠোরই হোক, তোমাকে ছেড়ে যাব না, কথা দিচ্ছি।

দেলেরা চোখের জল মুছে বললেন—প্রিয়তম, তোমার কথায় মনে হচ্ছে আমাদের বিচ্ছেদ-বেদনা সইতে হবে না। একটা কথা, কাল কাজীকে তোমার পরিচয় দিয়ে বলবে, আমি কোজণ্ডি নগরের বিখ্যাত মামুদ সওদাগরের পুত্র। পরিচয় পেলে আশাকরি কাজী অবশ্যই তোমাকে মুক্তি দেবেন।

পরদিন বিচারকালে কৌলফ কাজীকে লক্ষ্য করে বললেন—মহাশয়, আপনি আমাকে যতটা ভিখারী ভাবছেন, তা কিন্তু নয়। আমি কোজণ্ডি নগরের মামুদ সওদাগরের পুত্র। আমার পিতার বিত্তের তুলনায় এই মজাফর সামান্য ভিক্ষুক মাত্র। পিতা আমার দুরাবস্থার কথা শুনলে শত শত উটের পিঠে প্রচুর স্বর্ণ-মুদ্রা পাঠিয়ে দেবেন। দেশত্যাগ করে আসার সময়ে আমার সহস্রাধিক

স্বর্ণ-মুদ্রা দস্যুরা ছিনিয়ে নেয়। তাই মঠে আশ্রয় নিতে হয়েছে। পিতাকে সংবাদ দিন, হাতে হাতে প্রমাণ পাবেন।

কাজী মুহূর্তকাল নীরবে কাটিয়ে বললেন—তাই তো, এমন ভাগ্যবানের পুত্রকে তো আর পত্নী পরিত্যাগ করতে বলা যায় না।

তাহের কাজির আকস্মিক ভাবান্তরে মুষড়ে পড়ে বললেন—এ কী করছেন মশায়! একজনের মুখের কথাই বিশ্বাস করছেন?

কাজী মুচকী হেসে জবাব দিলেন—ঠিক আছে মিথ্যা প্রমাণ করতে পারলে ও কঠোর শাস্তি পাবে এবং পত্নী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হবে।

তাহের তাতেই আস্বস্ত হতে বাধ্য হয়ে বললেন—তবে এক কাজ করুন যত দিন সত্যাসত্য প্রমাণ না হয়, ওদের পৃথক থাকার ব্যবস্থা করুন।

কাজী অনুরূপ হেসেই জবাব দিলেন—তা কি করে হয়? মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পতি ও পত্নীকে পৃথক করা বিচার সঙ্গত নয়। ও মামুদের পুত্র হলে পত্নীকে নিয়ে যেখানে খুশী যেতে পারবে, অন্যথায় প্রাণদণ্ড।

বিচার-শেষে কৌলফ দেলেরার কাছে গিয়ে সব বৃত্তান্ত বর্ণনা করলেন। দেলেরা অভয় দিতে গিয়ে বললেন—ভয়ের কি আছে, দূত খবর নিয়ে আসার আগেই আমরা বোখরা নগরে পালিয়ে যাব।

কৌলফ আতঙ্কিত হয়ে বললেন—সে কী করে সম্ভব! মজাফরের লোকেরা কড়া পাহারা দিচেছ।

—কাজীর কাছে গিয়ে বল, শত্রুর গৃহে বাস করতে নিরাপদ বোধ করছি না। বিচার চলাকালীন আমাদের অন্যত্র থাকার অনুমতি দিলে বাধিত হব।

কাজীর কাছে প্রসঙ্গটা উত্থাপন করতেই তাহের রীতিমত হায় হায় করে উঠল। তীরবিদ্ধ বাঘের মত গর্জে উঠে বললেন নরাধম, কোন সাহসে এ-কথা উচ্চারণ করলি। জানিস দেলেরা আমাকে প্রাণাধিক ভালবাসে? দুর্ভাগ্যবশতঃ আজ তোর মত পাপিষ্ঠের হাতে পড়েছে।

কৌলফ শান্তস্বরেই জবাব দিল—এত উত্তেজিত হবার কি আছে? কাজির কাছে দেলেরাকে হাজির করলেই সমস্যা মিটে যাবে। তার মুখ থেকেই শোনা যাক, দেলেরা কাকে বেশী ভালবাসে, কাকেই বা পতিরূপে পেতে আগ্রহী।

দেলেরার জবানবন্দী

কাজির নির্দেশে দেলেরাকে বিচার-সভায় হাজির করা হল।

কাজির নির্দেশে দেলেরা ঘোমটায় মুখ ঢেকেই বললেন—ধর্মাবতার, আপনি সুবিচার করে আমার অভিলাষ পূর্ণ করুন। মামুদের পুত্র আমার অধিক প্রেমের পাত্র। আপনি মহানুভব, অনুমতি করুন, আমরা অন্যত্র গিয়ে বসবাস করি।

দেলেরার কথাটা কানে যেতেই তাহের দেলেরা: ওপর তর্জন-গর্জন শুরু করে দিলেন।

কাজী তাঁকে বাধা দিয়ে বললেন—তাহের ক্ষোভ সম্বরণ কর। ওরা যেখানে খুশি গিয়ে বাস করতে পারে। তবে কথা দিচ্ছি, বিচারে অপরাধী সাব্যস্ত হলে শাস্তি সে পাবেই।

তাহের আতঙ্কিত হয়ে বললেন—ধর্মবতার, এখানে থাকলে তবে তো বিচার করে তাকে প্রাণদণ্ড দেবেন। দূত ফিরে আসার আগেই তো সে অন্যত্র চলে যাচ্ছে।

কাজী আশ্বাস দিয়ে বললেন—চারদিকে প্রহরী নিযুক্ত করে দেব। চিন্তা করো না।

কাজীর অনুমতি পেয়ে কৌলফ দেলেরাকে নিয়ে এক সরাই-খানায় আশ্রয় নিলেন। দেলেরার বিয়ের যৌতুক হিসেবে প্রাপ্ত গহনা বিক্রী করে সুখে বাস করতে লাগলেন। তাদের এই বিচিত্র প্রেমের কথা শুনে কৌতূহলী হয়ে এক পুরুষ রাজ-পোষাকে সজ্জিত হয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। রাজপুরুষ কথা

প্রসঙ্গে বললেন—যুবক রূপবতী দেলেরার উপযুক্ত পাত্র তুমিই, তাহের কোনক্রমেই তার পতি হওয়ার যোগ্য নয়।

∴ রাজাকে হিতাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানে কৌলফ বললেন—মহারাজ, আপনাকে মিথ্যা বলব না। আমি মামুদের পুত্র নই, দেলেরাকে পাবার জন্য মিথ্যার আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছি। কোজন্ডী নগর থেকে দূত ফিরে এলেই মিথ্যার দায়ে আমার প্রাণদন্ড হবে। আমি প্রাণভয়ে ভীত হয়ে পড়েছি।

রাজপুরুষবেশী রাজা বললেন—তোমার দুঃখে আমি মর্মাহত। কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞ কাজির হুকুম নড়চড় হবার যো নেই। অদৃষ্ট সম্বল করে বসে থাকা ভিন্ন উপায় দেখছি না। ঈশ্বরই একমাত্র ভরসা। কৌলফকে সান্ত্বনা দিয়ে রাজা বিদায় নিলেন।

রাজা বিদায় নিলে দেলেরা বললেন—স্বামী, লোকটাকে কিন্তু সুবিধার মনে হল না। কৌশলে আমাদের উদ্দেশ্য জেনে নেবার জন্যই হয়ত এসেছিল।

—প্রিয়তমে, এটা হয়তো তোমার ভ্রান্ত ধারণা। লোকটাকে সজ্জন বলেই মনে হল। সত্যই তো ঈশ্বর বিনা কে আমাদের বিপদমুক্ত করতে পারেন।

এভাবে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার মধ্যে চৌদ্দ দিন উত্তীর্ণ হল। পনের দিনের দিন শমন এসে হাজির। কৌলফকে ও তাঁর হৃদয়েশ্বরীকে চির দিনের মত পরিত্যাগ করে বিদায় নিতে হল।

বিদায় মুহূর্তে দেলেরা কান্নায় বুক ভাসিয়ে বললেন—প্রাণেশ্বর, তোমাকে যদি মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত করে আমিও আত্মঘাতিনী হয়ে তোমাকে অনুসরণ করব। তোমাকে বিনা জীবনধারণ কল্পনাও করতে পারছিলেন!

কৌলফ ও দেলেরা যখন বিদায়পর্ব সারছিলেন তখন কাজী, দাসেনন্দ, মজাফর এবং তাহের উপস্থিত হলেন। কাজিকে দেখেই নিশ্চিন্ত বিপদাশঙ্কায় দেলেরা হঠাৎ মূর্ছা গেলেন।

কাজি কৌলফকে অবাক করে দিয়ে বললেন—কৌলফ তোমার

পিতার কাছ থেকে দূত ফিরে এসেছে। প্রমাণ পেলাম তুমি মামুদেরই পুত্র। না জেনে তোমার প্রতি অন্যায় করেছি, ক্ষমা কর। এই মুহূর্তে দেলেরা তোমার। ওকে নিয়ে যেখানে খুশি যেতে পার।

কাজির কথা শেষ হতে না হতেই এক দূত এসে কৌলফের হাতে এক পত্র দিল। দূত বলল—প্রভু, আপনার অবর্তমানে আপনার পিতা-মাতা বড়ই শোকে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, চলুন দেখা দিয়ে তাঁদের জীবন রক্ষা করবেন।

কৌলফ পত্র পাঠ করতে লাগলেন—প্রাণেশ্বর, তোমার অদর্শনে আমরা কত শোকসন্তপ্ত ও মর্মাহত চিঠিতে ব্যাখ্যা করা কঠিন। মজাফরের দূত মারফৎ তোমার কুশলাদি জেনে মনের চাঞ্চল্য কিছু প্রশমিত হল। তোমার জন্য চল্লিশটা উটের পিঠে হিরা-জহরত পাঠালাম। তোমার প্রতীক্ষায় আছি। ইতি মামুদ।

সুচতুর কৌলফ ব্যাপারটা সামলে নিলেন। কোন রকম বিস্ময় প্রকাশ করে কাজি বা অন্যান্যদের কিছুই বুঝতে দিলেন না।

কাজি তার সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে বিদায় নিলেন।

দেলেরার সংজ্ঞা ফিরে এলে কৌলফ তাঁর কাছে কাজির আগমনের কারণ বললেন। আর এ-ও বললেন—প্রিয়ে, আমাদের বিপদ কাটেনি। সওদাগরের পুত্র নুরুদ্দিন এই নগরেই রয়েছেন। তিনি এ-কথা শুনে কাজির কাছে অভিযোগ করতে পারেন। যতশীঘ্র সম্ভব আমাদের অন্যত্র চলে যাওয়া উচিত।

কৌলফ ও দেলেরা যখন নগর পরিত্যাগ করে যাওয়ার ব্যবস্থা করছেন তখন সেই রাজকর্মচারী এসে উপস্থিত হলেন। তিনি বললেন—কৌলফ তুমি মামুদের পুত্র এ কথা তখন অস্বীকার করেছিলে কেন? এখন তো সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল।

কৌলফ সামান্য ইতস্ততের পর বললেন—মহাশয়, আপনার কাছে কিছুই গোপন করিনি। আমি এখনও বলছি, মামুদ আমার পিতা নয়।

—কিন্তু তা না হলে তিনি কখনই এইসব ধনরত্নাদি পাঠাতেন না।

—আমারও কেমন অবাক লাগছে। হয়ত ভুল বশতঃই এগুলো পাঠিয়ে দিয়েছেন।

—তবে হয়ত বা সাধুপুত্র এই নগরেই বাস করছেন। তিনি এই ব্যাপারটা জানতে পারলে কাজির শরণাপন্ন হবেন। অতএব সব দিক চিন্তা করে তোমার উচিত যত শীঘ্র সম্ভব এই নগর পরিত্যাগ করা। কথা ক'টা বলে রাজপুরুষ বিদায় নিলেন।

রাত্রি গভীর হলে কৌলফ তাঁর পত্নী দেলেরাকে নিয়ে নগর পরিত্যাগ করার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময় বাইরে প্রচুর লোক সমাগমের শব্দ পেলেন। চিৎকার চেচাঁমেচি শুনে দরজা খুলে বাইরে আসতেই দেখেন বহু অশ্বারোহী সৈন্য দরজায় দাঁড়িয়ে। একজন ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে কৌলফকে অভিবাদন করে বলল—মহারাজ, আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমরা আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছি, চলুন।

কৌলফ রাজসভায় পেঁাছে দেখেন, মহারাজ সিংহাসনে বসে। উজির সসম্ভ্রমে তাকে মহারাজের সামনে নিয়ে গেলেন। কৌলফ নতজানু হয়ে রাজাকে অভিবাদন করলেন।

মহারাজ হেসে বললেন—কৌলফ, তোমার অসাধারণ প্রেমের কথা শুনে তোমাকে স্বচক্ষে দেখার জন্য কৌতূহল হয়েছিল, তোমার কাছে ছুটে গিয়েছিলাম। তোমার সত্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। মৃত্যু সুনিশ্চিত জেনেও তুমি এতটুকুও সত্য গোপন করনি। দ্বিতীয়বার আমি ছদ্মবেশে রাজপুরুষের পরিচয় দিয়ে দেখা করলেও তুমি নিজেকে মামুদের পুত্রের পরিচয় দিয়ে নিজেকে বাঁচাবার চেষ্টা করনি দেখে আমি খুবই মুগ্ধ হয়েছি। এই মুহূর্ত থেকে তুমি সব রকম বিপদ থেকে মুক্ত। তুমি আমার প্রাসাদেই থাক। তোমাদের প্রেমও আমাকে কম মুগ্ধ করেনি। তাই তো। কোজণ্ডি নগর থেকে দূত বিরূপসংবাদ নিয়ে ফিরে এলে আমি সঙ্গে সঙ্গে ভৃত্য পাঠিয়ে তাকে ডেকে আনি। সেই দূত মারফৎই মজাফরের নিকট ওই নকল পত্রটি পাঠিয়ে দেই। তোমার

জীবনরক্ষার যাবতীয় দায়িত্ব আমার ওপর ছেড়ে দিয়ে আজ থেকে তুমি আমার প্রাসাদেই থাক। কৌলফ রাজার কথা অবজ্ঞা করতে পারলেন না, দেলেরাকে নিয়ে রাজপ্রাসাদেই বসবাস করতে লাগলেন।

শুভ মিলন

বৃদ্ধা ধাত্রী এভাবে নানারকম গল্পচ্ছলে সুলতানের কন্যা ফরোখনাজকে হিতোপদেশ দান করতে লাগলেন। কিন্তু কোন কিছুতেই চঞ্চলা ফরোখনাজের মানসিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব হল না। কন্যার অবস্থা দেখে সুলতান খুবই ভাবিত হয়ে পড়লেন।

দীর্ঘদিন পরে এক অভাবনীয় ঘটনা ঘটল। এক কাক-ডাকা সকালে ফরোজনাজ মঠে উপস্থিত হলেন। মঠরক্ষীরা তাঁকে অভ্যর্থনাসহ মঠের ভিতরে নিয়ে গেলেন! মঠের প্রাচীরের গায়ে কৃতিশিল্পীর নিপুণ তুলির টানে আঁকা বহুবর্ণের সুদৃশ্য চিত্র ছিল। অত্যুৎসাহী সুলতান-কন্যা চারদিক ঘুরে ঘুরে চিত্রগুলি দেখতে লাগলেন।

অসংখ্য চিত্রের একত্র সমাবেশ ঘটলেও মাত্র দুটি চিত্রের দিকে ফরোখনাজ বিশেষভাবে আকৃষ্ট হল। একটি চিত্র শিল্পী এক হরিণীকে ব্যাধের জালে আটক অবস্থায় দেখিয়েছেন। হরিণটিকে জাল থেকে মুক্তি দেবার জন্য হরিণ প্রাণপণে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আর দ্বিতীয় চিত্রটিতে দেখানো হয়েছে, এক হরিণ ব্যাধের জালে আটক পড়েছে। হরিণীটি ব্যাধের জালে হরিণকে আটকা পড়তে দেখে প্রাণভয়ে দৌড়ে বাঁচাবার চেষ্টা করছে। ভুলেও হরিণটির কথা ভাবেনি।

চিত্র দুটি ফরোখনাজের মনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করল। তিনি তন্ময় হয়ে ভাবতে লাগলেন। আমার এতদিনের ধারণা কি তবে ভুল? আমি যে স্বপ্ন দেখেছিলাম পুরুষ-জাতি অত্যন্ত নিষ্ঠুর, আত্মকেন্দ্রিক, তা তো নয়।

ফরোখনাজ যখন এমনি ভাবনায় বিভোর তখন অকস্মাৎ সেখানে ধর্মযাজক এসে উপস্থিত হলেন। তাঁকে দেখেই তিনি যথোচিত ভক্তিসহকারে প্রণাম করে সসম্ভ্রমে এক পাশে দাঁড়ালেন। ধর্মযাজক ছোট্ট করে হেসে ডান হাতটি সামান্য উত্থিত করে আশীর্বাদ করলেন।

ধর্মযাজক ঠোঁটের কোণে অনুরূপ-হাসির রেখা টেনে বললেন— মা। এতদিন তুমি ভ্রান্ত পথে চলে নিজেই নিজেকে দগ্ধে মেরেছ। আমার কথা যদি শোন বলছি, তুমি তোমার মতিগতির পরিবর্তন করে ধর্মকর্মের মধ্য দিয়ে দিনাতিপাত কর। ঈশ্বরের সাধনায় নিজেকে লিপ্ত কর। মনের শান্তি ও স্বস্তি ফিরে পাবে, জীবনকে আর এক মুহূর্তের জন্যও দুর্বিষহ মনে হবে না। অজ্ঞানতার কুয়াশা কেটে গিয়ে ভোরের আলো ফুটে উঠবে। জ্ঞানের আলোর সংস্পর্শে এসে আত্ম পবিত্রতার পথে এগিয়ে যাবে। যথার্থ আত্মিক উন্নতি হবে।

ধর্মযাজকের কথায় ফরোখনাজের দু'চোখের কোণে জলবিন্দু দেখা দিল। ওড়নার কোণ দিয়ে চোখ মুছতে মুছতে বললেন প্রভু। এতদিনে আমার ভুল ভেঙেছে। আজ আমি মনস্থির করে ফেলেছি। ধর্মপথই আজ আমার কাছে একমাত্র অবলম্বন। পিতাকে আর কষ্ট দেব না। পিতার নির্দেশ পালন করব। আমি বিয়ে করে পিতার মনস্কামনা পূর্ণ করব।

সুলতান কন্যার মত পরিবর্তনের কথা শুনে খুবই আনন্দিত হলেন। কন্যার বিয়ের জন্য চারদিকে লোক পাঠিয়ে উপযুক্ত পাত্রের সন্ধান করতে লাগলেন।

পাত্রের খোঁজ পাওয়া গেল। কাশ্মীরের সুলতান বয়সে যুবক। সুদর্শন যুবাপুরুষ। শুভ মুহূর্তে কাশ্মীরের সুলতানের হাতে তিনি তাঁর প্রাণের ফরোখনাজকে তুলে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রাজ্যজুড়ে আনন্দ-উৎসব শুরু হয়ে গেল। নবদম্পতি সুসজ্জিত উটের পিঠে চড়ে কাশ্মীর-রাজ্যের দিকে এগিয়ে চললেন।

সমাপ্ত